ফল ফুল লইয়া প্রাতে কোথায় যায এবং সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আইসে। ব্রাহ্মণের ইহা জানিবার বড় কৌতূহল জন্মে। তাঁহার স্ত্রী এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া জগন্নাথের পূজার কথা তাঁহাকে বলিল এবং পিতার নিকট যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয়ের পর জামাতাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইল। বসু অনেক ইতস্ততের পর ব্রাহ্মণের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া লইয়া গেল। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে এক থলিয়া তিল দেন তিনি সেই তিল বুনিতে বুনিতে চলিযা যান। বসু যদি পথ না বলিযা দেয় তবে ঐ তিলের চারা হইলে সেই চারাগুলি লক্ষ্য করিয়া বাড়ী আসিতে পারিবেন। অনেক দূর গিয়া বসু তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ দেখেন অক্ষয় বটতলে একখণ্ড নীল প্রস্তর রহিয়াছে। ব্রাহ্মণকে রাখিয়া শবর কিছু দূরে গেল। ব্রাহ্মণ দেবতার পূজা করিলেন। শবর ফিরিয়া আসিয়া দেবতা দেখিতে পাইল না। দৈববাণী হইল "আর আমি জঙ্গলে থাকিতে পারি না, রাঁধা ভাত খাইতে চাই, এখন হইতে আমার নাম জগন্নাথ হইবে।" বসু জামাতাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। ব্রাহ্মণ তৎপরে মালোয়াতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে খবর দিলেন। রাজা সৈন্য সামন্ত লইয়া জঙ্গল কাটাইয়া দেবতা বাহির করিলেন। কিন্তু আত্মশ্লাঘা করিয়া বলিলেন আমার কি সৌভাগ্য আমি জগন্নাথ বাহির করিয়াছি। দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'তুমি আমার মূর্ত্তি গড়িবে কিন্তু আমায় দেখিতে পাইবে না।' ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু জগন্নাথ নাই। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাইলেন না, ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় ব্যস্ত;—রাজা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তপস্যাত আমাদের মত নয়, ব্রহ্মার তপস্যা কত শত বৎসর লাগে। ইতি মধ্যে তাঁহার সিংহাসনে কত রাজা রাজত্ব করিয়া লয় পাইলেন, মন্দিরটী ও ক্রমে মাটিতে পুতিয়া যায়, চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। সেই সময়ের রাজা সেই পথ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, মন্দিরের চুড়া ঘোড়ার পায়ে বাধে। রাজা ভূমি খনন করিয়া মন্দির বাহির করিয়া নিজের বলিয়া দখল করেন। এই সময়ে ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইলেন। দুই জনেই মন্দির আপনার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। মন্দির কাহার—ব্রহ্মা বিষম বিপদে পড়িলেন। সম্মুখে অক্ষয় বটবৃক্ষে ভূষণ্ডী কাক ছিল, ব্রহ্মা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কাকের নিকট জিজ্ঞাসা করায় কাক বলিল ইন্দ্রদ্যুম্নই যথার্থ অধিকারী। মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। জগন্নাথকে পাইবার জন্য রাজা তপস্যা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ কিন্তু কাষ্ঠ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। যেখানে পড়িয়াছিলেন সেই স্থান স্বপ্নে রাজাকে দেখাইয়া দিলেন। এই কাষ্ঠরূপী দেবতার নাম দারুব্রহ্ম। রাজা ৫০০ হাতী ও অনেক লোকজন লইয়া গেলেন, কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া টানাটানি হইল, কাঠ এক চুলও নড়িল না। তখন বসুকে ডাকিবার জন্য দেবতার আদেশ হইল। বসু আসিয়া ধরিবা মাত্র কাষ্ঠ উঠিয়া চলিল। সেই কাষ্ঠ হইতে সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি গড়িবার জন্য রাজা নানা দেশ হইতে ছুতার আনিলেন। সেই কাঠ যে কাটিতে যায় তাহারই অস্ত্র ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে স্বয়ং বিষ্ণু বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশে রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন ২১ দিনের মধ্যে আমি মন্দিরে বসিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া দিব কিন্তু ইহার মধ্যে কেহ মন্দিরের দ্বার খুলিতে পারিবে না। রাজা তাহাই স্বীকার করিলেন। বৃদ্ধ রুদ্ধদ্বারে মূর্ত্তি গড়িতে লাগিলেন। রাণীর ইতিমধ্যে জগন্নাথ

দেখিবার বড় ইচ্ছা হয়। রাজা ও রাণীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা দ্বার খুলিলেন। দেখিতে পাইলেন জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রার তিনটী মূর্ত্তি কোমর পর্য্যন্ত হইযাছে। সুভদ্রার হাত একবারেই নাই, জগন্নাথের ও বলভদ্রের হাতের কুনুই পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই প্রবাদের কতটা গল্প কতটা সত্য বলা যায় না।

ইতিহাসে ৩১৮ খৃঃ অঃ জগন্নাথের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সময়ে স্বস্তিপুর বা ত্রিপুরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র রক্তবাহু উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে আইসেন। উড়িষ্যার রাজা জগন্নাথদেবকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লয়েন, কেহ কেহ বলেন জগন্নাথকে লইয়াই অরণ্যে পলায়ন করেন। অরণ্যে দেবতা ১৫০ বৎসর ছিলেন। বসু এই মূর্ত্তি পূজা করিত। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মিত করেন। পুরীতে এখন যে মন্দির বিদ্যমান তাহা ১১৮৪ খৃঃ অঃ উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীম দেব গজপতি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে চৌদ্দ বৎসর লাগে, ১১৯৮ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ হয়। এই মন্দির নির্ম্মাণে ও বিগ্রহের রত্নালঙ্কারাদিতে প্রায় ৫ কোটী টাকা ব্যয় হয়। ১৫৫৮ খৃঃ মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় পুরীর দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া জগন্নাথকে লইয়া গিয়া গঙ্গার ধারে চিতা রচনা করিয়া দাহ করে। লোকে বলে কালাপাহাড় হাত পা খসিয়া মরিয়া যায়। এক ব্রাহ্মণ সেই অর্দ্ধদগ্ধ জগন্নাথকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। গঙ্গা তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যান, পরে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরে স্থাপন করে।

জগন্নাথের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, জগন্নাথ বৌদ্ধ দেবতা ও তাঁহার মন্দির বৌদ্ধ মন্দির বলিয়া বোধ হয়। কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ মিশ্রিত এক দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। জগন্নাথ বা বুদ্ধ বিষ্ণুর নবম অবতার।

গতি ও মতি।

শ্রাবণ মাসের দিন—দেখে লাগে ত্রাস।
পাহাড়ের মত মেঘ ছেয়েছে আকাশ॥
সকাল হইতে পড়ে ঝিমি ঝিমি জল।
পথ ঘাট ভিজে গিয়ে হ'য়েছে পিছল॥
মধু বিধু রাম শ্যাম গতি মতি হরি।
চাদরে জড়ায়ে বই ছাতি হাতে ধরি॥
এ কথা সে কথা ক'য়ে অতি সাবধানে।
গুটি গুটি যেতেছিল পাঠশালা পানে॥
এমন সময় হরি আছাড় খাইয়া।
প'ড়ে গেল, ছাতি বই গেল গড়াইয়া॥
গতি সে সবার বড় তাই না দেখিয়া।
আনন্দে উঠিল হেসে করতালি দিয়া॥
"কি মজা হইল দেখ আহা মরি মরি।
হরি প'ড়ে গেল—সবে বল হরি হরি॥"
মধু বিধু রাম শ্যাম ছিল যারা পাশে।
হরিবোল হাততালি দিয়া সবে হাসে॥
কেবল দেখিয়া তাহা হাসিল না মতি।
হরিরে তুলিতে ছুটে গেল দ্রুতগতি॥

হাতে ধরি' সযতনে তারে উঠাইল।
ছাতি আর বইগুলি আপনি লইল॥
"বেলা বেশি হয় নাই, চল সাথে গিয়ে।
তোমাদের বাড়ী তোমা আগে আসি দিয়ে॥"
এই বলি' হরি সনে হরিদের ঘরে।
সুদুঃখিত মন মতি গেল বরাবর॥
হরিরে দেখিয়া মাতা কাছে এসে তার।
শুনিলেন তারি মুখে সব সমাচার॥
কাদা জল ধুয়ে মুছে দিলেন হরির।
সমাদরে চুম্বিলেন বদন মতির॥
সঙ্গে দিয়ে লোক তার তখনি তাহায়।
দিলেন পাঠায়ে পাঠশালে পুনরায়॥
মতিরে দেখিয়া কন শিক্ষক তখন।
"আজি কিছু দেরি তব হ'ল কি কারণ?"
মতির সহিত যেই গিয়াছিল তথা।
শিক্ষকেরে নিবেদিল সমুদয় কথা॥
শুনিয়া মতির কাজ গুরু মহাশয়।
মধুর বচনে তারে দিলেন অভয়॥
সবার সম্মুখে হ'য়ে আনন্দে অধীর।
করিলেন বহুতর প্রশংসা মতির॥
মধু বিধু রাম শ্যাম গতির আচার।
শুনে তিনি করিলেন বড় তিরস্কার॥
কহিলেন—"বয়সের বড় বড় নয়।
হৃদয় যাহার বড়, বড় সেই হয়॥
মতি বটে ছোট তোমা সবাকার চেয়ে।
তবু সে সবার বড় ভাল মন পেয়ে॥
আর গতিনাথ বটে বড় সবাকার।
বড় হ'য়ে বড় নন কাজে আপনার॥
প'ড়ে গেল হরি, দেহে পাইল সে ব্যথা।
বল দেখি, কোথা এর আনন্দের কথা?
নীতি পায় পরাজয় যে মনের কাছে।
বনের পশুতে তায় প্রভেদ কি আছে?"
তিরস্কারে তাহাদের মাথা হ'ল নত।
বুঝিল হ'য়েছে কাজ অতি অসঙ্গত॥
মনে মনে কষ্ট কত পাইল তখন।
কষ্ট আরো কত, পরে শুনিল যখন॥
হরির হ'য়েছে জ্বর গায়ের ব্যথায়।
ছট্ ফট্ করিতেছে প'ড়ে বিছানায়॥
একটু হাসিতে আর একটি কথায়!
দেখ শেষে অনুতাপ আনে কত হায়!
আর এক সৎকাজের কিবা পুরস্কার।
অন্তরে বাহিরে ঢালে আনন্দ অপার॥
তার কত দিন পরে হ'য়ে রোগ হীন।
এসেছিল হরি ফের ইস্কুলে যেদিন।
বসেছিল আগে গিয়ে মতির নিকটে।
কত কথা ক'য়েছিল তায় অকপটে॥
মতিও তাহারে দেখি সুখী সুস্থকায়।
হাসিয়া কতই কথা ব'লেছিল তায়॥
এইরূপ তাহাদের আনন্দের হাসি।
দেখিয়া শিক্ষক সবে কহিলেন আসি॥—
"দেখ দেখি আজি এই মতির হাসিতে।
পারে কি না পারে মনে আনন্দ আনিতে!
না বুঝে পশুর হাসি—হাসি সেত নয়।
হাসিতে আনিলে হাসি তবে মিষ্ট হয়॥"

আমরা।

আজ পৃথিবী মানুষে পরিপূর্ণ। এমন কি এক এক স্থানে ক্রমে লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, সে স্থানের সকল লোকে পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। মানুষ এত বাড়িযাছে যে, কৃষিদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাতে সকলের কুলায় না। কিন্তু এমনও একদিন ছিল, যখন খাদ্য দ্রব্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আহার করিবার লোক ছিল না,—এমন একদিন ছিল যখন পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া একটা জীব ছিলই না।

মানুষের তবে কবে জন্ম হইযাছে, কি প্রকারে জন্ম হইয়াছে, কি প্রকারে মানুষ সৃষ্টির যাবতীয় জীবজন্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এবং ইহার পরই বা মানুষের কি হইবে?—তাহা জানিবার জন্য একটা কৌতূহল জন্মে। আমরা মানুষ, সুতরাং আমাদের গত জীবনের কথা এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে, সে প্রশ্ন মনে আপনা আপনিই উঠে—জানিবার জন্য স্বভাবতঃই একটা কৌতূহল জন্মে। অথচ এ প্রশ্ন এত কঠিন যে সহজে ইহা বুঝিবার যো নাই, সহজে এবং সংক্ষেপে বুঝানও যায় না। বড় বড় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরাই ইহার একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই,—ইহাঁদিগের মধ্যেও এ সম্বন্ধে নানামত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক সে সকল বিষয় লইয়া আমাদের কোন আলোচনার দরকার নাই। "আমাদের" সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

মানুষের কত বয়স তাহা ঠিক বলা দুঃসাধ্য, পণ্ডিতেরা এখনও তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমরা মামথ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া, পৃথিবীর যে চারিটী যুগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল যুগের স্তর পরীক্ষা করিয়া এবং পুরাতন কালের পর্ব্বতের গুহা প্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা অনেকে বলেন যে মামথ যে যুগের সৃষ্টি, মানুষের চিহ্ন সেই যুগে প্রথম দৃষ্ট হয়। এই সকল স্তর এবং পর্ব্বতগুহার মধ্যে মানুষের দাঁত এবং অন্যান্য স্থানের অস্থি এবং প্রস্তরের ও লৌহ প্রভৃতি নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় ছিল তখন কাঠ বা প্রস্তর প্রভৃতিদ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত, তারপর ক্রমে জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে লৌহ, প্রভৃতিদ্বারা অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিল। পৃথিবীর স্তরে এই সকল মানুষের চিহ্ন পাইয়াই পণ্ডিতেরা মানুষের কোন্ সময় জন্ম হইয়াছে, তাহা ঠিক না বলিতে পারিলেও, কতকটা স্থির করিতে পারিয়াছেন। মানুষের কত বয়স তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু, আমাদের বয়স লক্ষ লক্ষ বৎসরের কম নহে, ইহা একপ্রকার স্থির।

কবে মানুষ জন্মিয়াছে, তাহা যদি কতক জানিলাম, এখন কিপ্রকারে জন্মিয়াছে, তাহাই জানিবার জন্য কৌতূহল হইবে। এ প্রশ্ন আরও কঠিন। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে ক্রমোন্নতি একটা নিয়ম, অর্থাৎ সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থই ক্রমে উন্নতির দিকে যাইতেছে। কাল যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই, আজ যাহা আছে, কাল আর তাহা আসিবে না, প্রতিদিন পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রত্যেক পদার্থই প্রতিদিন উন্নতির দিকে যাইতেছে। এই নিয়মে নিকৃষ্ট জীব হইতে ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে একেবারেই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে? এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে মহা তর্ক চলিতেছে, ইহার

মীমাংসা করা আমাদের কার্য্য নহে। তবে ক্রমোন্নতিতেই মানুষের জন্ম হইয়াছে অনেকেই এই মত সঙ্গত মনে করেন।

এখন মানুষের সৃষ্টি হইলে, মানুষ তখন কি ভাবে দীন যাপন করিত তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। আজ মানুষের যে উন্নত অবস্থা দেখিতেছ, জন্মের সময় মানুষের কিছু এমন অবস্থা ছিল না। অসভ্য বানরবৎ অবস্থা হইতে এখনকার উন্নতি এবং সভ্যতায় আসিতে মানুষের কত বৎসর লাগিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? আজ মানুষ জীবজগতের রাজা। কিন্তু সেই আদিম উলঙ্গ অবস্থায় কি কষ্টে মানুষকে জীবন রক্ষা করিতে হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তখন গৃহ ছিল না, শীত নিবারণ করিবার জন্য বস্ত্র ছিল না, এখনকার সুখ সচ্ছন্দতা কিছুই ছিল না। তখন অবিশ্রান্ত ভয়ঙ্কর হিংস্র বন্যজন্তুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইত। কিন্তু এ কষ্টের দিনেও ক্রমে শেষ হইল। মানুষ দলবদ্ধ হইয়া, একত্র সমাজ স্থাপন করিয়া পরস্পরের সাহায্য করিতে লাগিল, এবং ক্রমে উন্নত হইয়া অবশেষে এখন জীবজগতের রাজা হইয়া বসিয়াছে।

এখন মনে উঠিতে পারে, মানুষের ভবিষ্যৎ কি? জীবজগতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতিতে ক্রমে কি করিয়া মানুষ সৃষ্ট হইল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা মামথ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া চারিটী যুগের বিষয় এবং সেই চারি যুগের প্রধান জীবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। সেই প্রথম যুগের মৎস্য হইতে কিপ্রকারে ক্রমে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি দ্বারা মানুষের সৃষ্টি হইল ভাবিয়া অবাক্ হইতে হয়। এখন মনে হয় মানুষ কি উন্নতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, অথবা যে ক্রমোন্নতির নিয়ম সৃষ্টির মধ্যে কার্য্য করিতেছে, তাহা চিরকালই চলিবে; সুতরাং উদ্ভিদের পরিবর্ত্তন এবং উন্নতিতে যে জীবজন্তুর সৃষ্টি এবং জীবজন্তুর পরিবর্ত্তন ও উন্নতিতে যে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও পরিবর্ত্তন হইবে? আজ মানুষ জীবজগতের রাজা, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রধান জীব। কিন্তু যে ক্রমোন্নতির নিয়মে জগতে কার্য্য করিতেছে, হয়ত তাহাতে মানুষেরও ক্রমে পরিবর্ত্তন হইবে, এবং একপ্রকার নূতন ও উন্নতজীব সৃষ্টির প্রধান জীব হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ কি তাহা কে বলিবে?

ফুলের সাজি।*

নবম অধ্যায়।

নির্ব্বাসিতের গৃহলাভ।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তথাপিও বৃদ্ধ দীননাথ ও তাহার কন্যা মনোরমার গমনের বিরাম নাই। তাহারা কত নগর, কত গ্রাম, কত বন ও নদী অতিক্রম করিল এবং কত প্রকার লোকের সঙ্গে তাহারা পরিচিত হইল,

* প্রবন্ধ লেখকের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গত বর্ষে ইহা শেষ হয় নাই। এবারে শীঘ্রই শেষ করিয়া দেওয়া যাইবে।

অবশেষে ১৫ দিন চলিয়া তাহারা প্রসাদপুর হইতে অন্যূন ৮০ ক্রোশ দূরে একটী স্থানে আসিয়া উপনীত হইল। পথে আসিতে তাহারা কোথায়ও আপনাদের বাস করিবার জন্য এমন স্থান দেখিতে পাইল না যথায় তাহারা সহজে উদারান্ন করিয়া লইতে পারে। এতদিন ভ্রমণ করিতে তাহাদের দ্বারিকানাথ প্রদত্ত যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহাও শেষ হইয়া গেল। দীননাথ কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, কেবলমাত্র ভরসা ঈশ্বর। ভিক্ষা করিয়া দিন গুজরাণ করা যদিও তাহাদের পক্ষে বড় কষ্টকর, তথাপি অবশেষে বাধ্য হইয়া তাহাও করিতে হইল। কেহ কেহ কটুবাক্যের সহিত তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বা সামান্য মুষ্টি ভিক্ষামাত্র দিত তাহাতে উভয়ের কোনরূপে একবেলা আহার হইত। হায় হায়! ধনী না হইলেও যাহারা এক সময়ে কত সুখে দিনযাপন করিয়াছে তাহাদের আজ দশা দেখিলে কোন্ কঠোর প্রাণ না ফাটিয়া যায়। দুঃখে মনোরমা ও দীননাথের সে বর্ণ ও কান্তি রহিল না, পরিচিত কেহ তাহাদিগকে এ অবস্থায় হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারিত কি না সন্দেহ।

একদিন তাহারা যাইতে যাইতে এক বনের মধ্যে পড়িল, সেখানে কোন গ্রাম বা মানবের চিহ্ন মাত্র নাই। বৃদ্ধ দীননাথ এতদিনের পথশ্রম, অনাহার প্রভৃতি ক্লেশে তথায় পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার কথা কহিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও বন্ধ হইয়া গেল। সে চলিতে চলিতে শেষে একটি আম্র বৃক্ষের তলে মূর্চ্ছিতের ন্যায় শুইয়া পড়িল, মনোরমার মনের তখন যে অবস্থা হইল তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকা সহজে অনুভব করিতে পারিতেছেন। নিকটে একটু জলপর্য্যন্ত নাই যে, মনোরমা তাহা পিতার মুখে দিয়া তাহাকে কতক সুস্থ করে। জলের জন্য তাহার চারিদিকে অন্বেষণ বৃথা হইল, সাহায্যের জন্য উচ্চ চীৎকার করাও মিথ্যা হইল। মনোরমা তখন অনেক ক্লেশে এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিল কিছু দূরে একটা কৃষকের বাড়ী রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হইতে নামিয়া যে দিকে কৃষকের বাড়ী দেখিয়াছিল সেই দিকে দৌড়িয়া অতি শীঘ্র সে বাটীতে গিয়া সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিল। ঐ বাটীর সকলে মনোরমার সজল নয়ন দেখিয়া ও শোকপূর্ণ ভগ্নস্বর শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। এক বৃদ্ধ কৃষক সেই গৃহের গৃহস্বামী, তাহার স্ত্রী এবং সে বড় সৎ ও দয়ালু। কৃষকপত্নী স্বামীকে একখানি গাড়ীতে দুটা ভাল বলদ যুড়িতে বলিয়া কহিল এস আমরা যত শীঘ্র পারি পীড়িত লোকটীকে আমাদের বাড়ী আনি। কৃষক তৎক্ষণাৎ গাড়ী প্রস্তুত করিল, কৃষকপত্নীও এককুঁজো ঠাণ্ডা জল, একটী ঘটীতে করিয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ এবং একটী বিছানা যোগাড় করিয়া লইল। বৃদ্ধ কৃষক মনোরমা ও আপন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে যেখানে বৃদ্ধ দীননাথ ছিল তথায় উপস্থিত হইল, তাহারা তথায় পৌঁছিয়া দেখিল দীননাথ উঠিয়া কতক সুস্থ হইয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করিয়া মনোরমাকে না দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল এক্ষণে পুনরায় তাহাকে এবং তাহার সহিত বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার বনিতাকে দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিল। সে দুগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া একটু সবল হইলে, মনোরমা গাড়ির উপর শয্যা পাতিল এবং তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া কৃষকের পর্ণশালায় উপস্থিত হইল।

কৃষকের বাড়ীর পশ্চাতে তাহার একখানি পরিষ্কার ঝর ঝরে কুটীর ছিল, কুটুম্বাদি আসিলে

তাহারা ঐ গৃহে থাকিত। কৃষক তাহার সেই ঘরখানি দীননাথ ও তাহার কন্যা মনোরমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দিল, সেই ঘরের পেছনে যে চাল দেওয়া রক ছিল তাহাতে তাহারা আপনাদের রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া লইল। ঘরখানি যদিও ছোট তবুও তাহার মেজে ও দেয়াল বেশ খট্ খটে শুক্‌না, এবং তাহাতে দুটী জানালা থাকায় ঘরটা তাহাদের বাসের উপযুক্ত হইল।

কৃষকপত্নী বৃদ্ধের শয়ন করিবার জন্য একখানি পুরাতন তক্তপোষ ও পিতা ও কন্যার শয়নের দুটী স্বতন্ত্র শয্যা দিল। মনোরমা ঘরের একপাশে মেজেতে আপনার বিছানা এবং অপরদিকে তক্তপোষের উপর পিতার শয্যা পাতিল, পিতা সুখে থাকিলে মনোরমা নিজের যতই কষ্ট হউক অকাতরে সহ্য করিতে পারে। ঘোর পথশ্রম, তাহার উপর অনাহারই দীননাথের অসুখের কারণ। দয়াবতী কৃষকপত্নী বৃদ্ধ দীননাথকে সুস্থ করিবার জন্য তাহাদের যতটুকু ক্ষমতা সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার ঘরে যখন যাহা থাকিত সে সমস্তই বৃদ্ধকে অর্পণ করিত।

দেখিতে দেখিতে শীতকাল অতীত হইয়া বসন্তের আরম্ভ হইল। আর রৌদ্র তত মিষ্ট লাগে না—প্রভাতে পাখীরা মিষ্ট গান করিয়া এখন সকলের শ্রবণকে আনন্দ দিতে লাগিল, যে সকল বৃক্ষের শীতকালে পত্র ঝরিয়া গিয়াছিল তাহাদের শাখা প্রশাখা এখন সতেজ পত্র ও মুকুলদ্বারা ঢাকিয়া গেল, আম্রের মুকুলের সৌরভে দিক্ সকল পূর্ণ হইল, ভ্রমরেরা মধু লোভে আম্র-বৃক্ষ শাখার চারিদিকে গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া উড়িতে লাগিল। যে দিকে দেখ সেইদিকেই সজীবতা, সেইদিকেই যেন কি এক অপূর্ব্ব শ্রী রাজত্ব করিতেছে।

যে গ্রামে মনোরমা ও তাহার পিতা আশ্রয় পাইয়াছিল তাহার একক্রোশ উত্তরে মাঠের মধ্যে একটী বাগান ও পুষ্করিণী আছে। বাগানটী বেশ বিস্তৃত, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামের কৃষকগণ সপরিবারে তথায় আসিয়া মিলিত হইত। তথায় তাহারা নৃত্য গীত ও ভোজন করিত। এই সমস্ত ব্যয়ের জন্য যাহার যাহা সাধ্য সে তাহা প্রদান করিত। সেই বৎসর আমাদের পূর্ব্বকথিত কৃষক ও তাহার স্ত্রী পরামর্শ করিয়া মেলায় যাওয়া বন্ধ করিল। তাহারা মেলার জন্য যে টাকা খরচ করিত তাহা বৃদ্ধের পথ্যের জন্য ব্যয় করিল। মনোরমা সর্ব্বদাই কৃষক ও তাহার পত্নীর নিকট তাহাদের এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত এবং নির্জ্জনে গিয়া ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিত,—বলিত "দয়াময় আমরা এই যে অযাচিত সাহায্য পাইতেছি ইহা আমাদের প্রতি তোমার অপার কৃপা ও স্নেহের ফল"। দীননাথ যখন যাহা বলিত তাহা সম্পন্ন করিয়াও মনোরমা আশ্রয়দাত্রী কৃষক পত্নীর অনেক গৃহ কর্ম্মের সহায়তা করিত। তাহার পরিষ্কার ও সুরুচি-পূর্ণ কর্ম্মে গৃহস্বামিনী তাহার প্রতি দিন দিন অধিক তুষ্ট হইতে লাগিল। মনোরমা কখনও বসিয়া থাকিত না যখনই দেখ সে একটা না একটী কর্ম্মে নিযুক্ত আছে।

মনোরমার শুশ্রূষায় ও কৃষকের সাহায্যে বৃদ্ধ দীননাথ আবার সুস্থ ও সবল হইল। দীননাথও অলস হইয়া থাকিবার লোক নহে; সবল হইলে সে সাজি ও চুপড়ি তৈয়ার করিবার জন্য মনোরমাকে বন হইতে লতা কাটিয়া আনিতে বলিল। সর্ব্বাগ্রে সে একটী সুন্দর কারেমী ঝুড়ি বুনিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ দয়াবতী কৃষক বণিতাকে উপহার প্রদান করিল। ঝুড়িটী এমন সুচারু

রূপে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল যে, যে তাহা দেখিল সেই কারীকরের প্রশংসা করিল। দীননাথ লতাগুলি কিছুদিন জলে পচাইয়া তাহাদের ছাল তুলিয়া প্রথমে সাদা করিয়া ফেলিল, পরে লতাগুলিকে নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া তাহা দ্বারা ঝুড়ি বুনিল এবং তাহার একটা মনোহর ঢাকনী করিয়া তদুপরি সাহায্য দাতা কৃষকের নাম লিখিয়া দিল, ঝুড়ির গায় কৃষকের বাড়ীরও একটী ছবি আঁকিয়া দিয়াছিল।

একদিন দীননাথ কৃষককে কহিল, "ভাই এত দিন ধরিয়া আমরা তোমার যে কত কষ্টের কারণ হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তোমার যে অবস্থা তাহাতে তোমার উপর আমরা গুরুতর ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছি, তাই বলি এখন ত আমি সবল হইয়াছি, আমায় বিদায় দাও, আমি স্থানান্তরে যাই।"

দীননাথের কথায় কৃষক মনে কিছু ক্লেশ পাইল এবং আপন হস্ত দ্বারা দীননাথের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "ভাই দীননাথ, কেন কি হইয়াছে যে, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আমি কি তোমার মনে কোন আঘাৎ করিয়াছি? তুমি ত অজ্ঞান নহ, তোমার মুখে বালোকোচিত এরূপ কথা শোভা পায় না।"

কোমল হৃদয় কৃষক বনিতা সজল নয়নে দীননাথকে বলিল "তুমি এখন এই স্থান পরিত্যাগ করিও না। তোমার ন্যায় বৃদ্ধের এ সময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া বিধেয় নহে! দেখিতেছ না কি সম্মুখে প্রখর গ্রীষ্মকাল আসিতেছে এ সময়ে পথে বাহির হইয়া তুমি কি আবার সঙ্কট পীড়ায় আক্রান্ত হইতে ইচ্ছা কর?"

দীননাথ তাহাদের এইরূপ বদান্যতা ও আগ্রহ দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল আমরা পাছে তোমাদের গৃহে থাকিয়া তোমাদের কষ্টের কারণ হই এইজন্য ঐরূপ কথা বলিয়াছিলাম।

কৃষক উত্তর করিল সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না—তোমরা আমাদের ভারগ্রস্ত হইবে কেন? তোমরা অনায়াসে তোমাদের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পার।

কৃষক পত্নী কহিল—মনোরমা যেরূপ সেলাই জানে তাহাতে সে একাই দুইজনের ভরণপোষণযোগ্য টাকা উপায় করিতে পারে, তাহার উপর তুমি যদি সাজি ও ঝুড়ি বুনিতে পার তাহা হইলে তোমাদের সকল অভাব দূর হইবে। তুমি আমায় যে ঝুড়ি দিয়াছিলে তাহা দেখিয়া অনেকে সুখ্যাতি করিয়াছে এবং তাহারা এইরূপ ঝুড়ি পাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তুমি যদি ঝুড়ি তৈয়ার কর আমি খরিদার জোগাড় করিয়া দিব। তখন দীননাথ ও মনোরমা যাহাদের নিকট এত উপকার পাইয়াছে এবং যাহারা তাহাদিগকে এত যত্ন করিতেছে তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করিতে পারিল না। কৃষকও তাহার স্ত্রী তাহাদিগকে স্বীকৃত হইতে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিল।

আলেক্জাণ্ডার সেল্‌কার্ক।

সখার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় রবিন্‌সন্ ক্রুসোর গল্প পাঠ করিয়াছেন বা শুনিয়াছেন। এই গল্পটী নিতান্ত অমূলক নহে। সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিকই একজন লোক বহুকাল ধরিয়া একাকী এক জনশূন্য দ্বীপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। সেই লোকটীর নাম আলেক্জাণ্ডার সেল্‌কার্ক। তাঁহার নির্জ্জন বাসের বিবরণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই ঘটনাটী পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া যে সাহস ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারে সেই বিপদ্‌কে জয় করিতে পারে। 'যাহার আত্মনির্ভর আছে ঈশ্বর তাহার সাহায্য করেন' এই ইংরাজী-প্রবাদ বাক্যটীর সার্থকতা আলেক্‌জাণ্ডার সেল্ কার্কের জীবনে পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই দক্ষিণ মহাসাগরে স্পানিয়ার্ডদিগের জাহাজ লুটপাট করিবার জন্য ব্রিষ্টল নগরের কয়েকজন ব্যবসায়ী দুই খানি পোত প্রেরণ করেন। এই জাহাজ দুই খানির নাম ডিউক ও ডচেস্। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ৫৬টী কামান ও ৩৩৩ জন লোক লইয়া জাহাজ দুইখানি ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ সাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ব্রাজিলের উপকূল পর্য্যন্ত গমন করিল। তাহার পর উহারা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণস্থ হরণ অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারী দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্ত্তী জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ্ দ্বীপের নিকট উপনীত হইল। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে ঐ দ্বীপের উপর একটী আলোক জ্বলিতে দেখিয়া ডিউক নামক জাহাজের কাপ্তেন রজার্স অনুমান করিলেন যে, কয়েকখানি ফরাসীদেশীয় জাহাজ ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়া আছে এবং তাহা হইতেই আলোক আসিতেছে; এবং এই অনুমানই সত্য স্থির করিয়া আপনার অধীনস্থ নাবিকদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

রজনী প্রভাত হইবামাত্র ডিউক ও ডচেস্ নামক জাহাজদ্বয়কে জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ দ্বীপের আরও নিকটে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু ফরাসি পোতের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া গেল না। আরও ভাল করিয়া এ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একখানি নৌকা পাঠান হইল। নৌকা তীরের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা গেল একজন লোক তীর হইতে একটী শাদা নিশান দেখাইতেছে। নৌকা আরও নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় নাবিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নৌকা তীরে লাগাইবার উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিল। লোমযুক্ত ছাগচর্ম্ম পরিধান থাকায় এই ব্যক্তিকে নিতান্ত বন্য রকমের দেখাইতেছিল। এই ব্যক্তির নামই আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্ক এবং ইহাঁর নির্জ্জনবাসের ঘটনা অবলম্বন করিয়া ডানিয়েল ডিফো নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার বিখ্যাত রবিন্‌সন্ ক্রুসোর উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। নবম সংখ্যা।

সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮।

ফুলের সাজি।

দশম অধ্যায়।

—•◦•—

অঙ্গুরীয় পুনপ্রাপ্তি।

পাঠক পাঠিকা। আসুন আমরা একবার প্রসাদপুরে কি হইতেছে দেখিয়া আসি। মনোরমা ও দীননাথ নির্বাসিত হইয়া গমন করিল। কিছুদিন অতীত হইয়া গেল, দীননাথের প্রতিবেশী এবং গ্রামস্থ অনেকেই তাহাদের জন্য বড় দুঃখিত হইয়াছিল। তাহাদের বিষয় লইয়া গ্রামে বহুদিন ধরিয়া আন্দোলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে আন্দোলন কমিয়া গেল। মনোরমা যে রাজমহিষীর অঙ্গুরীয় চুরি করিয়াছে তাহা অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করিল না। গ্রীষ্মকাল পড়িলে এক দিবস প্রবল ঝড় ও জল হইল। সেই ঝড়ে প্রসাদপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ঘর ও বৃক্ষ পড়িয়া গেল। প্রসাদপুরস্থ রাজ উদ্যানে রাজার বৈঠকখানা বাটীর অনতিদূরে একটী পুরাতন দেবদারু বৃক্ষ ছিল। ঐ দেবদারু গাছের কোটরে কাকেরা বাসা করিয়া থাকিত। ঝড় লাগিয়া গাছটীর মধ্যখান ভাঙ্গিয়া গেল। রাজা সেই সময়ে উদ্যানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার লোকদিগকে গাছটী কাটিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। পাছে গাছ পড়িয়া অন্য বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায় সেই জন্য তাহারা বৃক্ষের ভগ্ন অংশে একটী দড়ি বাঁধিয়া অন্য বৃক্ষ সকলকে রক্ষা করিল। রাজা, মহিষী, রাজকুমারী হেমলতা এবং দুটী অল্প বয়স্ক রাজকুমার সেই সময়ে তথায় দাঁড়াইয়া বৃক্ষ ছেদন করা দর্শন করিতেছিলেন।

যখন গাছটী মড় মড় শব্দ করিয়া ধরাশায়ী হইল, তখন রাজকুমারেরা বৃক্ষের অগ্রভাগে কোন ডালে একটী পাখীর বাসা দেখিয়া তাহা লইবার জন্য সেই স্থানে ছুটিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দেবেন্দ্র যেমন বাসাটী লইতে যাইবে, অমনি কি একটী পদার্থ তন্মধ্যে চক্ চক্ করিতেছে দেখিতে পাইল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দেবেন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া কনিষ্ঠকে কহিল ভাই সুরেন দেখ দেখ কি একটা বাসার ভিতর চক্ চক্ করিতেছে, সুরেন্দ্র হাত দিয়া সেইটী লইয়া বলিল “ও দাদা এ যে একটা আংটী”। রাজকন্যার পরিচারিকা আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মায়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল সে তাহাদের কুতূহল দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং আংটী দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিল “এই সেই আংটী”। তাহার মুখ মলিন ও বিবর্ণ হইল। কুমারেরা তখন এক দৌড়ে তাহাদের মার নিকট গিয়া মহা আনন্দের সহিত তাঁহার হাতে সেই আংটীটি উপহার দি।

কহিল "মা, কাকের বাসায় আমরা এই আংটী পাইয়াছি"। রাজমহিষী—অঙ্গুরীয় দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "তাই ত, এ যে আমার সেই হারান আংটী। দুর্ভাগ্য মনোরমা, সাধু দীননাথ আমরা তোমাদের প্রতি কি অবিচারই করিয়াছি। অঙ্গুরীয় পাইয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু আবার যদি মনোরমা ও বৃদ্ধ দীননাথকে দেখিতে পাই তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা শত গুণে সন্তোষ লাভ করি। তাহাদিগকে দেখা পাইলে তাহাদের সমুদায় সম্পত্তির সহিত এই আংটী এখনই তাহাদিগকে উপহার প্রদান করি"। রাজা, রাজকুমারী হেমলতা এবং নিকটস্থ সকলেই আংটী দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিষণ্ণ হইল। মহামূল্য আংটী পুনরায় মিলিয়াছে—এইটী যেমন আনন্দের কারণ, নির্দ্দোষী ও সাধু দীননাথ ও তাহার কন্যা অকারণে দেশান্তরিত হইয়াছে ইহা সেইরূপ কষ্টের কারণ হইয়াছিল।

হেমলতা বলিল "ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আংটী গাছের উচ্চ ডালে কাকের বাসার মধ্যে পাওয়া গেল। আংটী গাছের উপর কিরূপে যাইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" যাহারা গাছ কাটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজকুমারীকে প্রণাম করিয়া কহিল "রাজকুমারি! এ কথার জবাব যদি আমার নিকট শুনেন তাহা আমি বলিতে পারি। হেমলতা কহিলেন "দ্বারিক, ইহা বলিবার জন্য আর অনুমতি লইতে হইবে না, তোমার যাহা অভিপ্রায় স্বচ্ছন্দে বল"।

আমরা বনের মধ্যে যে সাধুহৃদয় কাঠুরিয়া দ্বারিকানাথকে বৃদ্ধ দীননাথ ও তাহার কন্যা মনোরমাকে যষ্টি ও টাকা দিয়া সাহায্য করিতে দেখিয়াছি এই বৃদ্ধ সেই দ্বারিকানাথ। দ্বারিকানাথ রাজকন্যার আজ্ঞা পাইয়া বলিল "এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দীননাথ বা মনোরমা কেহই আংটী চুরি করে নাই, বা চুরি করিয়া বৃক্ষের উপর তুলিয়া রাখে নাই। গাছের যেখানে পাখীর বাসা ছিল সে স্থান এত উচ্চ যে, তাহারা কোন মতে ইহার উপর উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ আংটী চুরি করিয়া বৃক্ষের উপর রাখে এমন সময়ও তাহাদের ছিল না। আংটী খোওয়া যাইবার অতি অল্প সময় পরেই তাহারা কারাবদ্ধ হইয়াছিল। আমি বেশ জানি কাকেরা চক্‌চকে ছোট কোন জিনিস দেখিলেই ঠোঁটে করিয়া আপনাদের বাসায় লইয়া যায়। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কোন কাকে সুযোগ ক্রমে আংটী লইয়া গিয়া বাসায় রাখিয়াছিল। ভগবান যে কি জন্য আমার হতভাগ্য বন্ধু দীননাথকে ও তাহার কন্যাকে বিষম পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন"।

রাজমহিষী দ্বারকানাথের এই কথা শুনিয়া কহিলেন "দ্বারিক, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি এখন সমস্ত পরিষ্কার বুঝিতেছি, কাকগুলা প্রতিদিন গাছ হইতে উড়িয়া আমার ঘরের জানালায় আসিয়া বসে এবং আমার বেশ মনে হইতেছে যখন হেমলতার সহিত আমি গৃহান্তরে মনোরমাকে কি উপহার দেওয়া যাইবে এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে যাই, তখন আংটীটি জানালার ধারে বাহির করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সময়ে জানালার উপরে একটী কাক বসিয়াছিল। মনোরমা ঘরের মধ্যে দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় কাক তাহার অজ্ঞাতসারে আংটী লইয়া বাসায় উড়িয়া যায়।

রাজা এতক্ষণ স্থিরভাবে সমুদায় শুনিতেছিলেন। তিনি এই সকল কথা বার্ত্তায় বেশ বুঝি-

লেন যে, দীননাথ ও তাহার কন্যা অকারণে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। রাজা কহিলেন নির্দ্দোষী দীননাথ ও মনোরমার প্রতি এই অবিচারের জন্য আমি বড় পরিতাপ পাইলাম; তবে আমরা জানিয়া শুনিয়া তাহাদিগকে কোন দণ্ড প্রদান করি নাই বলিয়া মন কতকটা সান্ত্বনা পাইতেছে। আমাদের অজ্ঞানতা ও মায়ার মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য এই ঘটনা হইয়াছে।

এক্ষণে যদি আমি দীননাথ ও তাহার কন্যাকে আবার দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে এই আংটীর সহিত তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া প্রদান করিতে পারি এবং সকল লোকের নিকট তাহাদের নির্দ্দোষীতার কথা জানাইতে পারি তবে আমার এ পরিতাপ দূর হইবে। রাজা এক্ষণে মায়ার দিকে সরোষে দৃষ্টিপাত করিলেন। মায়া তখন বলিদানের ছাগের ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। রাজা কহিলেন "পাপিয়সী, কোন সাহসে তুই এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আমাদিগকে প্রতারণা করিলি এবং একটী নীরিহ পরিবারকে একবারে নষ্ট করিলি, সাধু দীননাথ, সুশীলা মনোরমা তোর কি করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করাইলি"। তাহাকে এই কথা বলিয়া সন্নিহিত দুই জন প্রহরীকে আজ্ঞা দিলেন "ইহাকে হাজত ঘরে লইয়া মনোরমাকে যে শৃঙ্খল পরান হইয়াছিল সেই শৃঙ্খল ইহার হস্তে দেও, ইহাকে সেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত কর, এবং অকারণে মনোরমাকে যেরূপ বেত্র প্রহার করা হইয়াছিল সেইরূপ ইহাকেও বেত্রাঘাত কর। যাহা কিছু অর্থ ও দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়াছে রাজ ভাণ্ডারস্থ কর। কল্য প্রাতে ইহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া যেন ইহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়"।

যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, রাজার এই কথা শুনিয়া চমকিত হইল তাহারা তাঁহার মুখে কখন এরূপ কথা শুনে নাই বা তাঁহাকে এত ক্রুদ্ধ হইতেও দেখে নাই। রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলে তাহারা আপনাআপনি মায়া সম্বন্ধীয় নানা কথা কহিতে লাগিল।

একজন প্রহরী মায়ার হস্ত কঠিন করিয়া ধরিয়া বলিল "পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়—এ কথাটা কি তোর জানা ছিল না"।

আর একজন প্রহরী মায়ার অপর হাত ধরিয়া বলিল "এখন মিথ্যা কথা ও জুয়াচুরির ফল টের পাবে তা জানিস" "ধর্ম্মের ঢোল আপনি বাজে"।

অপর একজন চাকর বলিল "মনোরমার প্রতি মায়ার ঈর্ষানল এত প্রবল হইয়াছিল যে, সে অনাতরে মিথ্যা কথা কহিয়া মনোরমা ও তাহার পিতার সর্ব্বনাশ করিল। মায়া একবার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় আর সত্য বলিতে সাহস করে নাই—এ কথাটীও খুব সত্য যে পাপকে মনের ভিতর একটু স্থান দিলে শেষে সে অল্পে অল্পে সমস্ত মনটাকে অধিকার করে"।

রাজার অশ্ব চালক এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল সে বলিল "যাহা হউক মায়া এখনও যদি আপনার দোষের জন্য অনুতাপ করে তাহা হইলেও ভাল, নচেৎ পরকালে কি বলিয়া যে জবাব দিবে জানি না। কেহ বাগানে আগাছা রাখে না—যে গাছে ফল না হয় তাহা কাটিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ।"

ক্রমে আংটী পুনঃ প্রাপ্তির কথা গ্রামের সকল লোকেই জানিতে পারিল। রাজা—বিচারককে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেন শীঘ্র সমস্ত প্রজাবর্গকে সংবাদ দিয়া বিচারালয় প্রাঙ্গণে একত্র করিয়া মনোরমা ও দীননাথের নির্দ্দোষীতার বিষয় প্রমাণসহ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

বিচারপতি মনোরমা ও দীননাথকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি যথাসাধ্য সুন চিরিয়া বিচার করিতেন তথাপি তাহার হৃদয়ে দয়া ছিল। তিনি উপস্থিত প্রজাগণকে ডাকিয়া বলিলেন— দেখ আমি না বুঝিয়া অকারণ একটী নির্দ্দোষা বালিকা ও একটী সাধু লোককে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। মানুষ যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, তাহার ভুল হইতে পারে।

একজন আছেন যাঁহার বিচারে ভুল নাই— যিনি সর্ব্বদর্শী, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই কেবল প্রকৃত দোষীকে চিনিতে পারেন। দেখ এই আংটী যে লইয়া গিয়াছিল বা কাহার দোষ ছিল কোন মানুষ তাহা জানিতে পারে নাই। মানুষ বিচারক সহজে ভুলিয়া নির্দ্দোষীকেও দণ্ড দিয়া গেল— তাহার মানুষের হৃদয়ের কথা জানিবার উপায় নাই।

পৃথিবীতে অনেক সময় নির্দ্দোষী ব্যক্তিও শাস্তি পায় এবং পাপীও কখন কখন পুণ্যাত্মা বলিয়া লোকের নিকট আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করে। যিনি সকলের মনের গুপ্ত পাপ সকলও জানেন সেই অন্তর্যামী ভগবান আজ কৃপা করিয়া, ইহলোকেই নির্দ্দোষী দীননাথ ও তাহার কন্যার মিথ্যা অপবাদ মোচন করিয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারিণী মায়ার শাস্তি বিধান করিলেন। যেরূপ ঘটনায় অঙ্গুরীয় পুনরায় পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিলে কি বোধ হয় না যে, ইহা ঈশ্বরের নিজের কৃত? কাহার ইচ্ছায় এরূপ ঝড় হইয়া বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া গেল, কাহার ইচ্ছাতেই বা রাজকুমারেরা তাহা দেখিতে পাইয়া রাজ্ঞীর নিকট আনিয়া দিল। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মায়া নিজেই সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া চীৎকার করিয়া মনোরমার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিয়া দিল। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার প্রায় হইয়াছে। পৃথিবীর লোক পাছে মনে করে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর অলীক সেই জন্য ঈশ্বর সময়ে সময়ে এই ইহলোকেই পাপীকে দণ্ড বিধান ও নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিয়া দেন।

বিচারক কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন যে, উপস্থিত লোকদিগের অন্তরে তাহা বিদ্ধ হইল।

তাহারা মনোরমা ও দীননাথের মিথ্যা অপবাদ দূর হইয়াছে দেখিয়া মহা আনন্দে যথাস্থানে গমন করিল।

রাজ আজ্ঞায় তিন চারি জন দূত মনোরমা ও দীননাথকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইল বটে, কিন্তু কেহই তাঁহাদের সন্ধান করিয়া আসিতে পারেন না। ক্রমশঃ

নিষ্ঠুর আমোদ।

তোমরা অনেকেই হয়ত ভেড়ার লড়াই দেখিয়া থাকিবে। মজা ও তামাসা দেখিবার জন্য দুইটা ভেড়াকে উত্তেজিত করিয়া ভেড়ার লড়াই দেখা হয়। ভেড়া দুইটা দূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া পরস্পরকে সজোরে ঢু মারিতে থাকে, ইহাতে অনেক সময়ে ভেড়াদের শিং ভাঙ্গিয়া গিয়া রক্তারক্তি হয়।

আবার বাঙ্গলা দেশের কোন কোন স্থানে গোয়ালাদের এক রকম পরব আছে তাতে যে সব গরুর নূতন বাছুর হইয়াছে সেই গরুতে আর শূয়রে লড়াই বাধান হয়। আসল কথা বুনো শূয়রে আর গরুতে লড়াই, কিন্তু কাযে আর তা হয় না। গোয়ালারা একটা শূয়রের ছানা আনে, আর অনেক লোক জন, ঢাক ঢোল লইয়া সাজ সজ্জা করিয়া অতি সমারোহের সহিত কোন বিস্তৃত মাঠে যায়। সেই খানে শূয়রের ছানা ছাড়িয়া দিয়া কয়েকটী গরুকে উত্তেজিত করিয়া দেয়, গরুগুলি সেই ছানাটীকে পদদলিত ও শৃঙ্গাঘাত করিতে থাকে। ছানাটী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে। যত পলাইতে যায় গরুগুলি ততই চারিদিক হইতে আসিয়া শৃঙ্গাঘাত করিতে করিতে তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। এসব নিষ্ঠুরতা।

• আমরা কুস্তি দেখি, জিম্‌নাষ্টিক্‌স্ দেখি, সার্কাস নানা রকমের ব্যায়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুক দেখি। ইহাতে কোনই দোষ নাই। কিন্তু এই গুলিই চরমসীমায় উপস্থিত হইলে আর নিষ্ঠুরতার অবধি থাকে না। আমরা মজা দেখিবার জন্য যদি দুটী লোককে তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করি আর তাহারা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে আমরা মজা দেখিতেছি তাহারা যুদ্ধ করিতে আর রাজি নহে, তাহারা নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদের নিকট কত অনুনয় বিনয় করিতেছে তথাপি আমরা মজা দেখিবার জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতেছি, এরূপ হইলে নিষ্ঠুরতার এক শেষ হয়।

পুরা কালে রোম নগরে এই রূপ আমোদ বড় প্রচলিত ছিল। ২৬৪ খৃঃ পূঃ ইহার আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ রোম নগরের কোন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টীক্রিয়ার সময় রাজ ভাণ্ডার হইতে এইরূপ নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখিবার আয়োজন হইত। এই তামাসা প্রকাশ্য স্থানে হইত এবং সকলেরই দেখিবার অধিকার থাকিত। সমস্ত ব্যয় রাজ ভাণ্ডার হইতে নির্বাহিত হইত। তৎপরে যাঁহার পয়সা থাকিত যিনি দেশ শুদ্ধ লোকের আমোদ যোগাইবার ব্যয় ভার বহন করিতে পারিতেন তিনিই তাঁহার আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে ঐরূপ আমোদের যোগাড় করিতেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত মৃত্যু উপলক্ষেই এই নিষ্ঠুর আমোদের চলন ছিল। তারপর মজা দেখিবার ও আমোদ করিবার নেশা চড়িয়া গেল। তখন স্বজনের মৃত্যু বা অন্য কোন বিশেষ ব্যাপার উপলক্ষের জন্য আমোদ বাঁধিয়া থাকিত না; যাঁহার যখন সুবিধা হইত ও যখন পয়সা খরচ করিতে পারিতেন তখনই নগর শুদ্ধ লোকদিগকে মজা দেখাইয়া আমোদিত করিতেন। এই তামাসা দেখিবার জন্য রোম নগরে অনেক বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যেটা সেটাই প্রসিদ্ধ, তাহার নাম কলোসীয়াম্। এত বড় অট্টালিকা পৃথিবীর কোথায়ও নাই। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ চক্রাকার প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের উপর চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে বসিবার আসন। এই আসনের পরপর অনেক সার ছিল। এই কলোসীয়ামে এক লক্ষ লোকের বসিবার স্থান ছিল। এটী নিষ্ঠুর ক্রীড়া দেখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। এই খানে সকল অবস্থার লোকই দলবদ্ধ হইত। সম্রাট হইতে ক্রীত দাস পর্য্যন্ত এই স্থানে আসন পাইত। বৃদ্ধ, যুবা, গৃহিনী নববধূ সকলেই মারামারি কাটাকাটি রক্তপাত ও যন্ত্রণার চীৎকারে হরষিত হৃদয় হইয়া গৃহে ফিরিতেন।

যে দিনের তামাসাটা কিছু বেশী রকমের বা নূতন ধরণের হইত সে দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই কলোসীয়ামের সমস্ত স্থান পূরিয়া যাইত। কখন কখন পূর্ব্ব রাত্রেই সমস্ত স্থান ভরিয়া যাইত। ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের সম্মুখের স্থান সম্রাট, তাঁহার সভাসদ্ এবং যাঁহার ব্যয়ে এই ক্রীড়া হইত তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তৎপরে নগরের অন্যান্য বড় লোকের জন্য চোদ্দসারি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তৎপরে সাধারণ লোকের বসিবার স্থান, তার পরে মহিলাদের বসিবার স্থান, তৎপরে দাস দাসীদের বসিবার স্থান ছিল। বসিবার স্থানে মধ্যে মধ্যে নিভৃত ফোয়ারা থাকিত, সময়ে সময়ে সে ফোয়ারা হইতে সুগন্ধি জল উঠিয়া দর্শকবৃন্দের গাত্রে পড়িত। সময় হইলেই বাজনা বাজিয়া উঠিত যোদ্ধারা সসজ্জিত হইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিত। যোদ্ধাদের নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র থাকিত। কেহ জাল হস্তে প্রবেশ করিত, প্রতিদ্বন্দীকে জালবদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কেহ ঢাল, তরবারি হস্তে আসিত। কাহারও সর্ব্বাঙ্গ লৌহ চর্ম্মে আচ্ছাদিত, কেহ বা একবারে উলঙ্গ হইয়া আসিত। কাহারও এক হস্তে বল্লম অপর হস্তে এক খণ্ড বস্ত্র। ইহারা সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিত। প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তৎপরে তিন চারি জন মিলিয়া যুদ্ধ হয়। যাহারা যুদ্ধে মরিয়া যায় তাহারা নিষ্কৃতি পায়, যাহারা আহত হয় তাহাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। সিংহ গর্জ্জন করিয়া নিরুপায় আহত ব্যক্তির উপর লাফাইয়া পড়ে আর চতুর্দ্দিক হইতে দর্শক বৃন্দেরা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠে। আর এক ব্যক্তি আসিয়া সেই সিংহ বা ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে যদি তাঁহার জয় হয় তবে মহিষ, বন্য বরাহ বা কুম্ভীরের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। রক্তস্রোতে প্রাঙ্গণ কর্দ্দমযুক্ত এবং পিচ্ছল হয়, মৃত মনুষ্য ও পশুদেহে ভরিয়া যায়। ক্রূর সম্রাট নীরোর সময়ে এই আমোদ আরোও জঘন্য আকার ধারণ

করিয়াছিল। নীরো যুবতী কুমারী ও শিশু বালক বালিকাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দিয়া মজা দেখিতেন। হানোরিয়াসের রাজত্ব কালে টেলিমেকাস্ নামক কোন ধর্ম্ম যাজক দুই যোদ্ধার মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া দর্শকবৃন্দেরা ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অবধি হইতে এই আমোদ একেবারে উঠিয়া যায়।

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। বালোসীয়ামের প্রাঙ্গণে এক যুবক সিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাকে সিংহ ধরিয়া বন্ধন করিতে হইবে। অস্ত্রের মধ্যে হস্তে এক খণ্ড বস্ত্র। ইহার নিকটে সিংহ আসিলেই ইনি এই বস্ত্র সিংহের মাথার উপর ফেলিয়া সিংহের চোখ দুটী ঢাকিয়া দেন এবং সিংহের কোমরে যে লোহার বেড় সংলগ্ন ছিল তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া সিংহকে টানিয়া লইয়া যান।

আদর্শ বালক।

অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ কুসুমের ন্যায় কে ঐ বালক যাহার কমনীয় কান্তি পরিবারস্থ সকলের মনে অপার আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। সে যেখানে যাইতেছে সেই স্থানই অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। তাহার হাসি হাসি পবিত্র মুখখানি যে দেখিতেছে তাহারই মনের অন্ধকার দূর হইতেছে। যে দেখিতেছে তাহারই মনে হইতেছে আবার দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করি। অতি ক্রূর ব্যক্তিও তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য সরল হইতেছে, কঠোর হৃদয়ও নরম হইয়া তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব দেখাইতেছে।

কে ঐ বালক, যে সরলতা ও চাপল্য মাখা নয়ন দুটী এদিক ওদিক ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিতেছে। বুদ্ধির নূতন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরে স্বাভাবিক জ্ঞান স্পৃহা প্রবল হইতেছে। হৃদয়ে নূতন ভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণে ভালবাসার বীজ সঞ্চারিত হইতেছে।

কে ঐ বালক যাহার পিতামাতার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা দিন দিন প্রগাঢ় হইতেছে। পিতা বা মাতা কেহ পীড়িত হইলেন, তাহার কচি মুখখানি শুখাইয়া গেল, প্রাণ অভিভূত হইল। পীড়িত পিতা বা মাতা যাহা আদেশ করিতেছেন সে সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাই পালন করিতেছে, তাহার যতটুকু সাধ্য সে তাঁহাদের সেবা করিতে ত্রুটি করিতেছে না—সে তাঁহাদিগকে ঔষধ সেবন করাইতেছে, পথ্য প্রদান করিতেছে।

কে ঐ বালক, যে ছোট ছোট ভাই ভগ্নিগুলিকে ভালবাসিতেছে ও যত্ন করিতেছে, কোন ভাল দ্রব্য বা আহারীয় পাইলে তাহাদিগকে না দিয়া আপনি লইতেছে না, তাহাদের গায় কখন হাত তুলিতেছে না। তাহাদের সহিত একত্র ভ্রমণ, একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া তৃপ্তি অনুভব ও সুখ বোধ করিতেছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগকে শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদের অনুগত হইয়া চলিতেছে।

কে ঐ বালক, যে প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে

শয্যা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া করি করি হাত দুটী যোড় করিয়া অবনত মস্তকে দয়াময় হরির চরণ বন্দনা করিতেছে।

কে ঐ বালক, যে প্রভাতে বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া শরীরকে সবল ও সুস্থ এবং মনকে প্রফুল্ল করিতেছে। ব্যায়ামের পর মনোযোগের সহিত পাঠ্যাভ্যাস করিয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইতেছে। কে ঐ বালক, নিত্য নিয়মিত কালে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া সন্তোষজনক পাঠ আবৃত্তি দ্বারা শিক্ষকের তুষ্টি সাধন করিতেছে। বিদ্যালয়ে তাহার এক দিনও অনুপস্থিতি নাই, শ্রেণীর মধ্যে সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্কুলের পাঠ আরম্ভ হইলে তাহার মুখে একটী অন্য কথা নাই—মন অন্যদিকে নাই, কেবল নিজের পাঠেই তাহার মন রহিয়াছে?

খেলিবার সময় কে ঐ বালক যে একটী মন্দ কথা মুখে আনিতেছে না, কেবলই তাহার হাসি মুখ সকল খেলুড়ের সহিত তাহার সদ্ভাব। কাহারও সহিত ঝগড়া নাই বরং খেলুড়েরা পরস্পর বিবাদ করিলে সে মিষ্টভাবে ও মিষ্ট কথায় তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেছে?

কে ঐ বালক, যাহার মুখে সদাই আনন্দের হাসি,—যে সদানন্দ যাহার মিষ্ট কথাই আভরণ, যে মিষ্ট কথা বলিবার জন্য কখন মিথ্যা কথা বলে না—কারণ সত্যকে সে প্রাণের সমান ভালবাসে?

কে ঐ বালক, যে পরের মহামূল্য দ্রব্যও ধূলার ন্যায় জ্ঞান করে, ভ্রমেও অপরের একটা তৃণে হাত দেয় না?

কে ঐ বালক, যে সকলের নিকট অবনত; যাহার মুখে একটী গর্ব্বের কথা নাই আকৃতিতে যেন বিনয় মাখা রহিয়াছে। তাহার বসন ভূষণের পারিপাট্য নাই, জাঁকজমক নাই অথচ কখন সে মলিন বস্ত্র পরিধান করে না, চুলের পারিপাট্য নাই অথচ তাহার চুলগুলি সুপরিষ্কৃত, দেহে সুগন্ধ লেপন নাই তথাপি তাহার গাত্রে কোন দুর্গন্ধ নাই, তাহার বইগুলি ছিন্ন বা মসি রঞ্জিত নহে। তাহার পড়িবার গৃহ ও শয়নের গৃহ কেমন পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সম্পন্ন।

কে ঐ বালক, যে অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও অনাথ বালক বালিকা দেখিলে যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিতোষের সহিত আহার করাইতেছে এবং নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে তাহাদিগের সাহায্য করিতেছে তাহার প্রাণ অন্যের দুঃখে দুঃখী, অন্যের সুখে সুখী?

কে ঐ বালক, যে গৃহপালিত বিড়াল কুকুর গাভি বা অশ্বের প্রতি সদাই দয়ালু ও যত্নশীল। যে আমোদের জন্য কখন ভ্রমেও একটী পতঙ্গের প্রাণে কষ্ট দেয় না বা কোন জীবের প্রাণ নষ্ট করে না?

কে ঐ বালক, গৃহ পালিত পশু পক্ষীরাও যাহাকে দেখিতে ভালবাসে, যাহার হস্ত প্রদত্ত খাদ্য, আহার ও জলপান তাহাদের ভাল লাগে, যে কত যত্ন-করিয়া তাহাদের গাত্রে হস্ত বুলাইয়া দেয়?

কে ঐ বালক, যে কখন অপরিমিত ভোজন করে না, নিমন্ত্রণে গিয়াও কখন অতিরিক্ত ভোজন করে না, সুতরাং পীড়া তাহার নিত্য সহচর নহে, যাহার খেলিবার সময় খেলা, পড়িবার সময় পড়া, যে কখন তাস বা কড়ি স্পর্শ করেনা?

কে ঐ বালক, যে কখন অসৎ বালকদের সঙ্গে বেড়ায় না, অসৎ বা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা দূরে থাকুক কখন তাহা শ্রবণও করে না এবং নিজেও অভদ্র ভাবে থাকে না।

কে ঐ বালক, যে দাস দাসীর প্রতিও ক্রোধ করে না, দাস দাসীদিগকে তুমি বই তুই বলিয়া সম্বোধন করে না—এজন্য দাস দাসীরাও তাহার কোন কথা কখন অবজ্ঞা করে না?

কে ঐ বালক, যাহার প্রাণে অল্পে অল্পে ভগবানের প্রতি ভালবাসা স্থান লাভ করিতেছে, সে তাহার নিত্য পূজা করিতে শিক্ষা করিতেছে এবং তাহার বিমল প্রাণে ঈশ্বরের বিমল সত্বা প্রতিফলিত হইতেছে।

প্রকৃত গৌরব।

(প্রিয়, মতি ও নবীনের সহিত শিক্ষকের কথোপকথন।)

শিক্ষক। বল দেখি লোক মাঝে গৌরব কাহার?

মতি। অতুল ঐশ্বর্য্য আর বৈভব যাহার;
দাস দাসী অনুচর যার প্রতিক্ষণ
পলক না হতে করে আদেশ পালন;
দ্বারদেশে ভিখারীর দল শত শত
অনুগ্রহ ভিক্ষা যার করিছে নিয়ত;
অসংখ্য মানব-শির নত পদতলে
তাহারি গৌরব সত্য, এই ভূমণ্ডলে।

নবীন। জ্ঞানে যেই বড় হয় গৌরব তাহার
বিদ্যাবলে বাড়ে মান জগতে সবার।
দরিদ্র বিদ্যার বলে ধনীর উপরে;
কে না জানে জ্ঞানবান খ্যাত চরাচরে?
ফুরায় ধনের সঙ্গে ধনীর গৌরব;
বিদ্যাবলে চিরদিন পূজিত মানব।

প্রিয়। "বল বল বাহুবল" জগতে প্রচার;
ধনে জ্ঞানে কি করিবে বল নাহি যার?
সমস্ত জগত-ব্যাপী বীরের গৌরব;
তার কাছে কোন ছার বিদ্যা বা বৈভব?
কেনা জানে বোনাপার্টি সিজরের খ্যাতি?
সেকেন্দর হানিবল বীর মহামতি?
থার্ম্মপলি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণন,
না শুনেছে পৃথিবীতে আছে কোন্ জন?
ভীমার্জ্জুন কর্ণ আদি বীরের বিক্রম
এখনো রয়েছে খ্যাত লক্ষমুদ্রা (১) সম।
বীরত্ব বিহনে সদা এই ধরা-ধামে
ধনী জ্ঞানী খ্যাত হয় কাপুরুষ নামে।

শিক্ষক। সত্য বটে ধনে জ্ঞানে পূজিত মানব
সত্য বটে এসংসারে বীরের গৌরব।
কিন্তু এক স্থান আছে জগত-উপরে
ধন মান বল যেথা পশিতে না পারে।
কেবল জ্ঞানের সেথা নাহিক গৌরব
ধর্ম্মমাত্র মানুষের প্রকৃত বৈভব।
ধনী যবে দরিদ্রের দুঃখ নাশ তরে
মুক্ত হস্তে আপনার ধন ব্যয় করে;
জ্ঞান দ্বারা সত্যাসত্য করিয়া নির্ণয়
জ্ঞানী যবে নিরন্তর সত্যপথে রয়;
স্বদেশ উদ্ধার কিম্বা পর উপকারে
বীর যবে আত্ম-প্রাণ দেয় অকাতরে;

(১) "লাখ টাকা।"

তখনি ত ধনী জ্ঞানী মহাবীরগণ
লোক-মাঝে হয় সত্য গৌরব ভাজন।
রাবণের সম ছিল প্রতাপ কাহার ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য বাহুবলে যার অধিকার।
বেকনের জ্ঞান রাশি সমুদ্র সমান,
সেকেন্দর বোনাপার্টি বীরের প্রধান,
এবে কি তাদের নামে মানব-হৃদয়,
শ্রদ্ধা আর ভক্তিরসে কভু সিক্ত হয় ?
কিন্তু দেখ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার
এখনো মানব-মনে করিছে বিহার।
চিরদিন সমভাবে জগতের জন,
শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁর পদে করিবে অর্পণ।
অতএব জান স্থির এই কথা সার :—
"চরিত্র যাহার, সত্য গৌরব তাহার।"
আপনার স্বার্থ-ভুলে পরহিত তরে
সাধু-কার্য্যে ফলাফল চিন্তা নাহি করে;
সত্য কথা সত্য কাজ সত্য আচরণ
বিপদে সম্পদে রাখে ঈশ্বরেতে মন।
এই ভাবে হয় গত জীবন যাহার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমভাবে গৌরব তাহার।

ভাই বোন।

৩য় পরিচ্ছেদ।

(৯৪ পৃষ্ঠার পর)

আজ জলের বড় আনন্দ! কেন না স্থলের পরাজয়! স্থল ও জলের চিরকাল সংগ্রাম চলিতেছে। কখনও বা গভীর সমুদ্র গর্ভ হইতে স্থলের জয়পতাকা-স্বরূপ দ্বীপপুঞ্জ উঠিতেছে; আবার কখনও বা জলের পরাক্রমে সমৃদ্ধিশালী গ্রাম, নগর, রাজপ্রাসাদ নদী ও সমুদ্র গর্ভে যাইতেছে। আজ যে উচ্চতম পর্ব্বতশিখর মস্তক উন্নত করিয়া আপনাব প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে হয়ত সমুদ্র গর্ভই তাহার জন্মস্থান ছিল; এবং বর্ত্তমানে যেখানে অতল সমুদ্রের তরঙ্গ সকল নাচিতেছে ও খেলিতেছে হয়ত ভবিষ্যতে সেখানেই আবার স্থলের বিজয় নিশান উড়িবে। এ সংগ্রামে চিরদিন জলেরই জয়। পৃথিবীর অধিকাংশই জলের অধিকার। তবুও লোভের নিবৃত্তি হয় না। "যত পায় তত চায়।" আজ আবার সমুদ্রের পরাক্রম প্রকাশিত হইবে—জলাধিপতির জয় হইবে। তাই জলের এত আনন্দ! তর তর শব্দে আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে বিজয় ঘোষণা করিতেছে। যাহারা স্থলের প্রজা সে শব্দে তাহাদের অন্তর কম্পিত হইতেছে। পৃথিবীর মুখ বিষাদে ঢাকা—

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জল যেন অন্ধকারে সুযোগ পাইয়া প্রফুল্ল মনে শত্রুর দুর্গ অধিকার করিতেছে।

জল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। আধ হাত, এক হাত, দু হাত জল উঠিল—ঘর দরজা জিনিষ পত্র সকল জলের উদরসাৎ হইল—তবুও জলের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। জীবন রক্ষক জল আজ জীবন ভক্ষক হইয়াছে—পশু পক্ষী মানুষ কীট পতঙ্গ না হইলে সে রাক্ষসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। যে জগতের পিপাসা নিবারণ করে আজ তাহার পিপাসা নিবারণের জন্য জগতের সমস্ত প্রাণীর শোণিত চাই।

বসু বাবু সন্তান সন্ততি লইয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতে ছাদের উপর বসিয়া কি ভাবিতেছেন? চারিদিকে গভীর অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না। কেবল জলের ও বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ এবং মধ্যে মধ্যে মানুষের হাহাকার ও আর্ত্তনাদ। যতই রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ততই জলের শব্দ ও হাহাকার শব্দ বাড়িতে লাগিল। বসু বাবুর করুণ হৃদয় আজ এই দুর্য্যোগের দিনে মানুষের দুঃখ দেখিয়া বিগলিত হইল। কেবল মানুষ কেন? পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এ ঘোর প্রলয়ের প্রবল পরাক্রম হইতে পরিত্রাণ পাইল না। সমস্ত জগতের ক্রন্দনধ্বনিতে আজ অন্ধকার আকাশ পূর্ণ হইল। বসু বাবু একবার আকাশের দিকে চাহিলেন;—দেখিলেন, সে গভীর আঁধারে আশার একটী মাত্র আলোকও নাই; তখন কাতর স্বরে বলিলেন:—"ভগবান! এ হাহাকারে কি তোমার দয়া উছলিত হইল না? তোমার সন্তান সন্ততির এ হৃদয়ভেদী প্রার্থনা কি অন্ধকার ভেদ করিয়া তোমার নিকট প্রবেশ করিতে পারে না? দয়াময়! কোন পাপে আজ পৃথিবীর এ দুর্দ্দশা? দোষী, নির্দ্দোষী, পাপী, সাধু সকলেরই আজ এক গতি, এক অবস্থা। লীলাময়! তোমার এ বিচার মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। এই ঘোর বিপদের সময় তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় আপনার পুত্র কন্যা পরিবারের কথা ভুলিয়া পরের জন্য বিগলিত হইল! ইহাকেই বলে মহত্ত্ব! ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব!।

যাহাদের খড়ের ঘর তাহারা বহু পূর্ব্বেই জলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে—স্রোতের হাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। মানুষ, বিড়াল, কুকুর, শেয়াল সকলেই স্রোতের মুখে চলিয়াছে এবং যেখানে উচ্চ স্থান, বৃক্ষ অথবা বাড়ীর ছাদ সেখানে প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। বসু বাবুর ছাদের উপরেও ক্রমে অনেকে জড় হইল। কিন্তু সে কতক্ষণ? জলের বেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বসু বাবু দেখিলেন আর উপায় নাই—মুহূর্ত্ত পরেই সকলকে ভাসিতে হইবে—জলের স্রোতে সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হইবে—চিরদিনের জন্য স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র পুত্র কন্যাদিগকে জলের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে এবং হয়ত আপনাকেও সংসারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তখন তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "প্রস্তুত হও আর সময় নাই। আমাদের যতদূর সাধ্য তাহা করিয়াছি এখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রক্ষা করিতে হয় তিনিই করিবেন আর যদি মারিতে হয় তবে তিনিই মারিবেন।" এই বলিয়া ছেলে ও মেয়ে দুই জনকে দুই ক্রোড়ে করিলেন। এবং সস্নেহে তাহাদের মুখ চুম্বন করিলেন। সে দৃশ্য কি চমৎকার! এক দিকে যেমন পিতা মাতা সন্তান সন্ততির রক্ষার জন্য আপনাদের কথা ভুলিয়াছেন অপর দিকে

তেমনি সন্তান সন্ততিও পিতা মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া এ ভয়ানক বিপদের কথা ভুলিয়াছে। সন্তান সন্ততি যেমন পিতা মাতার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয় চিত্তে রহিয়াছে তেমনি পিতা মাতাও আবার জগতের পিতা মাতা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্থির রহিয়াছেন; মানুষ যদি সকল সময়ে বুঝিতে পারিত যে তাহাদের রক্ষার জন্য সদা সর্ব্বদা একজন আপনার নিরাপদ ক্রোড় পাতিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইলে আর তাহারা বিপদের সময় এত চিন্তিত ও আকুল হইত না।

বসু বাবু এই বিপদের সময়ে স্থিরভাবে রহিলেন বটে কিন্তু সে ভাবে আর অনেকক্ষণ থাকিতে হইল না। জল ক্রমে ক্রমে গলা পর্য্যন্ত উঠিল—তখন তাঁহারা ছেলে মেয়েদিগকে কাঁধের উপর উঠাইলেন। কিন্তু জলের সঙ্গে কতক্ষণ সংগ্রাম চলে? মানুষের ক্ষুদ্র বল কতক্ষণ সে পরাক্রম সহ্য করিতে পারে? আর এক ঢেউ—জলের আর এক আক্রমণ—তাহা হইলেই সমুদায় শেষ হইবে। সকলেই সেই যমদূত-স্বরূপ তরঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই অদূরে জলের ভয়ানক গর্জ্জন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ক্রন্দন ও হাহাকার এবং জীব জন্তুর বিকট চীৎকার শ্রুত হইল। পলকের মধ্যে সে তরঙ্গ—সে হাহাকার—বসু বাবুর ছাদের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ছাদে যাহারা ছিল তাহারা সে হাহাকারের শব্দ বৃদ্ধি করিয়া তরঙ্গের শরণাগত হইল। পলকের মধ্যে কত স্নেহ, প্রণয়, ভক্তি, ভালবাসা সে জলের গর্ভে ডুবিল—কত আশা ভরসা ধন সম্পদ সে স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া গেল। গভীর আঁধার ও জলের তর তর শব্দ ভিন্ন সংসারে আর কিছুই রহিল না। জলের স্রোত আনন্দে নাচিতে নাচিতে—বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে—সমুদ্রের দিকে চলিল। কেন না আজ জলের জয় স্থলের পরাজয়।

ক্রমশঃ

চন্দন কাঠ।

উদ্ভিদ্‌বেত্তারা এ পর্য্যন্ত যত প্রকার বৃক্ষের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন, চন্দনের মত সৌগন্ধ বৃক্ষ আর একটিও দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে মহিসুর, কোয়েম্বাতুর এবং শালেম জেলা হইতে দক্ষিণে মদুরা এবং উত্তরে কোল্‌হাপুর পর্য্যন্ত চন্দনের জন্মভূমি। ইহারা ২০০০ হইতে ৩০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ভূমিতে এবং সামান্য ও শুষ্ক মাটিতেই অধিকাংশ পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে চন্দনের বড় আদর। পৌত্তলিকদিগের পক্ষে দেব-পূজার জন্য ইহা একটি নিত্য পদার্থ। ইহা ছাড়া চন্দনের কাঠ হইতে এক প্রকার তৈল-সার প্রস্তুত করা হয় যাহা "চন্দনের আতর" বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। মহিসুরে এই আতরের খুব কারবার চলিয়া থাকে। এই আতর কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় জাতিই ব্যবহার করেন। তন্মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণই ইহার অধিক পক্ষপাতী। বৃক্ষের গোড়ের

কাষ্ঠ অপেক্ষা মূল হইতে যে আতর সংগ্রহ করা হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। চন্দনের বিচি হইতেও এক প্রকার ঘন তৈল বাহির হয়, যাহা দক্ষিণাত্যের দুঃখী লোকগণ সময়ে সময়ে দীপ প্রভৃতির জন্য জ্বালাইয়া থাকে।

এতক্ষণ চন্দন কাষ্ঠ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম তাহা পাঠক পাঠিকাদিগের অনেকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বোধ করি জানেন। কিন্তু এ সকল গুণ ছাড়া এমন একটি বিশেষ কার্য্যে চন্দন কাষ্ঠ ব্যবহার করা হয় যাহার জন্য জগতের অন্যান্য জাতির নিকট ভারতবাসীরা যথেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছেন। সেইটি বলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে বোম্বাই, সুরট, আহম্মদাবাদ এবং কানাড়া, এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে মহিস্থর ও ত্রিবাঙ্কুরে চন্দন কাষ্ঠ খুদিয়া যে সকল চমৎকার দ্রব্য তৈয়ার করা হয় তাহা পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই দেখেন নাই। ছবির ফ্রেম, পাখা, বাক্স, কলমদান, কাগজকাটা প্রভৃতি ব্যবহার্য্য জিনিস এই কাষ্ঠ হইতে যে কতদুর সুন্দর ভাবে তৈয়ার করা হয় তাহা যাঁহারা কখন চক্ষে না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। কানাড়া ও মহিস্থরের কার্য্য প্রায় একরূপ ও সমান। ইহাতে হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। সুরট ও আহম্মদাবাদের কার্য্য একটু বিভিন্ন। উহাতে দেব দেবী এবং বৃক্ষ লতাদি উভয় প্রকার কারিকুরিই একত্রে জড়িত। আর একটি কথা। মহিস্থর ও কানাড়ার চিত্র সমুহ যত অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ হইতে খুদিয়া বাহির করা হয় অপরাপর জায়গার দ্রব্যগুলি তত গভীর করিয়া খোদা হয় না। এ সম্বন্ধে শিল্প জগতে কানাড়া ও মহিস্থরের সম্মানই অধিক।

বোম্বাই প্রদেশে আর এক প্রকার কারিকুরি দেখা যায়। শুদ্ধ চন্দন কাঠের জিনিশ তৈয়ার না করিয়া কখন কখনও বা নানা প্রকার লতা পাতা কাটা বাক্স প্রভৃতির চারি ধারে ও মাঝে মাঝে হাতির দাঁত ও আবলুশ কাঠ বসাইয়া জিনিসগুলিকে সাজান হয়। এইরূপ কায করা বাক্স প্রভৃতি সাহেব মহলে "Bombay boxes" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চন্দনের চামর বড়ই সুন্দর। প্রায় এক গজ লম্বা একখণ্ড সার কাষ্ঠ হইতে সূচি প্রমাণ সূক্ষ্ম এক একটি কাঠি খুদিয়া বাহির করিয়া ঐ সকল কাঠি একত্র গোছা বাঁধিয়া একটি কাঠের বা হাতির দাঁতের বাঁটের সহিত সংলগ্ন করা হয়। এই চামরের হাওয়া ক্ষণকাল সেবন করিলে প্রাণ পুলকিত হয়। বড় বড় রাজা মহারাজাদিগকে ব্যজন করিবার জন্য চামর ব্যবহার করা হয়।

মহিস্থরের ১৭ইঞ্চি লম্বা, ১১ইঞ্চি চওড়া ও ৮ইঞ্চি উচ্চ একটি উত্তম কাজ করা দেব দেবীর মূর্ত্তিযুক্ত একটি বাক্সের মূল্য ২০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা। জহরৎ বাক্স ৪০৲ হইতে ৮০৲; দস্তানা বাক্স ২০৲ হইতে ২৫৲; তাসের খোল ১০৲ হইতে ১২৲; কাগজ কাটা ৩৲ হইতে ৪৲; পাখা ॥০ হইতে ১৬৲; চামর ১৫৲ হইতে ৭০৲; ছড়ি ১০৲ হইতে ২৫৲; এবং কলমদান ৪৲ হইতে ১০৲ টাকা।

বালকের সততা।

মহম্মদ খাঁ নামক একজন সওদাগব গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে মর্ণিং পোষ্ট নামক পত্রিকায় নিম্ন লিখিত ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছেন।

"১৮৮৮ সালের গ্রীষ্মকালে আমি বান্দা নগর দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় কোন নদীর পার্শ্ববর্ত্তী এক উদ্যানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। যাইবার সময় ব্যস্ততাবশতঃ একটী ছোট ব্যাগ যাহাতে আমার প্রভুর ৫০০০৲ টাকা মূল্যের নোট ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য ছিল তাহা ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়াই আমি টের পাইলাম যে, ব্যাগ ফেলিয়া আসিয়াছি এবং সেই মুহূর্ত্তেই ফিরিলাম। পথিমধ্যে ১৩।১৪ বৎসব বয়স্ক একটি বালকের সহিত পণ্ডিতের পুকুবেব নিকট সাক্ষাৎ হইল। বালক আমাকে উৎকণ্ঠিত ও ত্রস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিল "কিছু হাবাইয়াছেন কি?" আমি উত্তর করিলাম হাঁ। বালক আমার ব্যাগ আমাকে ফিরাইয়া দিল। আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ব্যাগ খুলিয়া তাহার মধ্যে কি আছে তাহা বালককে দেখাইলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি প্রকারে এই প্রলোভন সহ্য করিলে। বালক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল যে আমি বাল্যকাল হইতে পর দ্রব্যকে ঢিলের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এবং তাহার জনক জননীকে অভিনন্দন করিলাম যে তাঁহারা এমন অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কাফের বলিয়া তাহার ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার প্রতি যে ঘৃণা ছিল তাহার পরিবর্ত্তে আমি তাহাকে স্বর্গীয় দূত ভাবিলাম। বালককে আমি ৫৲ টাকা দিতে চাহিলাম কিন্তু সে তাহা লইল না; বলিল যে আমি আপনার জন্য কিছুই করি নাই।

বালক এই প্রকারে আমাকে রক্ষা না করিলে আমি জেলে যাইতাম; ও আমার সর্ব্বনাশ হইত। আমি একজন দরিদ্র কাবুলী, আমার আর কোন সাধ্য নাই। চিরকাল জগদীশ্বরের নিকট বালকের জন্য প্রার্থনা করিব। বালকের নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বান্দা জেলা স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে পাঠ করে।"

আলেক্‌জাণ্ডার সেল্‌কার্ক।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর।)

আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্ক একজন স্কটলণ্ড দেশীয় লোক তিনি জাহাজে কাজ করিতেন। ঐ জাহাজের কাপ্তেন ষ্ট্রাড্লিং উপরি লিখিত ঘটনার চারি বৎসর চারি মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে এই দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কালের মধ্যে ঐ দ্বীপের নিকট দিয়া অনেক জাহাজ গিয়াছিল, কিন্তু দুই খানি মাত্র ঐ স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। উহারা স্পানিয়ার্ড জাহাজ এবং

উহার নাবিকেরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে; তাহাতে নিকটস্থ অরণ্যে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। ডিউক জাহাজের কাপ্তেন রজার্স তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ দিয়া গিয়াছেন;—

ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে বলিলেন যে স্কটলণ্ডস্থ ফাইফ্‌থায়োরের অন্তঃপাতী লার্গো নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি নাবিকের কর্ম্ম শিক্ষা করেন। তিনি যে জাহাজে কাজ করিতেন তাহার কাপ্তেনের সহিত মনান্তর ঘটায় ও জাহাজের স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া জ ঠিতেছে দেখিয়া তিনি প্রথমে নিজ ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্জ্জন দ্বীপে থাকিতে চান। কিন্তু পরে সে পবিত্যাগ পূর্ব্বক জাহাজে ফিরিয়া যাইবার ভপ্রায় প্রকাশ করিলে কাপ্তেন আর তাঁহাকে পুনঃ গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি তাঁহার বস্ত্রাদি, শয্যা, একটী বন্দুক, কিঞ্চিৎ বারুদ ও গুলি, এক খানি ছুরি, একটী জল গরম করিবার পাত্র, একখানি বাইবেল ও অন্য কয়েকখানি পুস্তক, গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কয়েকটী যন্ত্র ও অন্য দুইটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া সেই জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আহারান্বেষণ ও অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যে আপনাকে ব্যস্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু প্রথম আট মাস তাঁহার একাকী থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। তিনি পিমেণ্টো নামক এক প্রকার বৃক্ষ দ্বারা দুই খানি কুটীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং বড় বড় ঘাস দিয়া তাহার চাল ছাইয়া ছিলেন। ঘরের ভিতরে ঝড় বৃষ্টির গতিরোধ করিবার জন্য বৃক্ষনির্ম্মিত প্রাচীর ছাগ চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন; ঐ দ্বীপে অনেক ছাগল মুক্ত অবস্থায় চরিয়া বেড়াইত। যত দিন বারুদ ও গুলি ছিল ততদিন তিনি গুলি করিয়া ছাগল মারিতেন পরে বারুদ ফুরাইয়া গেলে দৌড়িয়া ছাগল ধরিতেন। বারুদের অভাবে তিনি দুইখণ্ড পিমেণ্টো কাষ্ঠ একত্র ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। কুটীর দুই খানির মধ্যে একখানি বড় ও এক খানি ছোট। তিনি ছোট খানিতে রন্ধনাদি ও বড়খানিতে শয়ন করিতেন। জীবন ধারণোপযোগী কার্য্য করিয়া যে সময় থাকিত সেই সময় পাঠ, প্রার্থনা, ধর্ম্ম-সঙ্গীত গানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঐ নির্জ্জন বাসের সময় তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাঁহার জীবনে সেরূপ কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না তাহাও সন্দেহস্থল।

ক্রমশঃ।

ধাঁধা।

এক একটা কথার দুরকম অর্থ হয় সে একটা ধাঁধা। আবার কয়েকটা কথা লইয়া তার এক একটার অর্থ বা উচ্চারণগত সাদৃশ্য দেখাইয়া কোন নূতন কথা গড়া বা একটা বড় কথার কয়েকটী অংশের অর্থ দিয়া সে কথাটা কি সিদ্ধান্ত করাও ধাঁধা। অর্থাৎ যাহা হঠাৎ সহজে বুঝা যায় না একটু ভাবিতে হয়, যাহার জন্য একটু মাথা ঘুরাইতে হয় তাহাই ধাঁধা।—যেমন "আমার আধ খানা সাহেব আধ খানা বাঙ্গালী, কিন্তু দুই অপদার্থ বল ত আমি কি ফল?" আবার দেখ "হস্ত পদ নাহি তার নাহি বাক্ শক্তি, কৌশলেতে কথা কয় বুঝে কার শক্তি। পবন সমান হয় তাহার গমন, বিদ্যুৎ আকার তার সমস্ত লক্ষণ।" এই দুইটী ধাঁধা। আবার তোমরা গোলক ধাঁধা জান, স্লেটে পেনসিল দিয়া

দেয়াল লাইন টানিয়া ঘর আঁক, সেই ঘর হইতে কি উপায়ে বাহির হইতে পারা যায় তাহা স্থির করাও একটা ধাঁধা। আবার এক ঘটি জলের ভারে একজন মানুষকে তিন হাত উপরে তোলা যায় ইহাও একটা ধাঁধা।

এবার তোমাদের এক রকম ধাঁধার কথা বলিতেছি এগুলি চোখের ধাঁধা। বর্ষাকালে গঙ্গার বা অন্য কোন নদীর জল বাড়িয়া যখন খুব স্রোত হয় তখন দুই ধারের জল অপেক্ষা নদীর মাঝ খানের জল অধিক বেগে বহিতে থাকে। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া মাঝখানের জলের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া যদি ধারের দিকে তাকান যায় তবে বোধ হইবে যেন ধারের জল উজান বহিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। সাদা কাগজের উপর পয়সার মত কাল দাগ আর কাল কাগজের উপর পয়সার মত ঠিক তত বড় সাদা দাগ দিয়া যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে সাদা দাগটা কাল দাগ অপেক্ষা বড় দেখাইবে। চতুর্থী বা পঞ্চমী তিথিতে উজ্জ্বল অৰ্দ্ধ চন্দ্রের উপর অনুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উজ্জ্বল অংশটা সেই রেখা ছাড়াইয়া তাহার বাহিরে পড়িয়াছে দেখায়। এটাও ধাঁধা।

নীচে এক রকম ধাঁধার ছবি দিলাম। এই পৃষ্ঠা খুলিয়া সখা খানি ভাঁজ করিয়া ছবিটা সম্মুখে রাখিয়া ডান হাতে সখার নীচের ডান কোনা ধরিয়া যদি ঘোরাবার মত করে কাগজ খানি শীঘ্র শীঘ্র নাড়িতে থাক (অর্থাৎ ডান কোনা ধরিয়া কাগজের বাম দিকের কোনাকে পেনসিল মনে করে টেবিলের উপর বা দেওয়ালে যদি গোল চাকা আঁকা যায় তবে যেরূপ গতি হয় সেইরূপ গতি দিলে) দেখিতে পাইবে যে ছবির সব চাকাগুলি আপন আপন কেন্দ্রের উপর ঘুরিতেছে। যত শীঘ্র হাত ঘুরাইবে তত শীঘ্র চাকাগুলিও ঘুরিতে থাকিবে। যে দিকে কাগজ ঘুরাইবে, চাকাগুলিও সেইদিকে

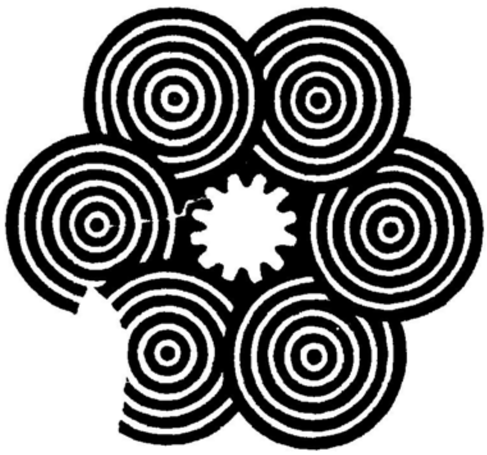

ঘুরিবে। কিন্তু এই ছবির ভিতরে যে খাঁজ কাটা সাদা চাকাটী আছে সেটী বিপরীত দিকে ঘুরিবে। এ চোখের ধাঁধা, বাস্তবিক চাকাগুলি ঘুরে না। অথচ দেখায় যেন ঘুরিতেছে।

পত্রপ্রেরকদের প্রতি।

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, সিলং—১৮৮৬ সালের সখার মূল্য শ্রীমানের নিকট এখনও বাকী আছে। দুই বৎসরের পূর্ব্বের ঋণ এখনও শোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। সম্প্রতি তাগীদ দেওয়াতে উক্ত শ্রীমান টাকা না দিয়াই যেরূপ অশ্লীল ভাষায় আমাদিগকে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার ভদ্রতা জ্ঞান যে কিছুমাত্র আছে এমন বোধ হয় না। আমরা ইহার অভিভাবককে উপদেশ দিই যে, তিনি যেন ইহাকে পুনর্ব্বার গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষার্থে পাঠাইয়া দেন, তথায় দুই চারি ঘা বেত্রাঘাত ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা ইহার চরিত্র ভাল হইবার সম্ভব নহে।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। দশম সংখ্যা।
অক্টোবর, ১৮৮৮।

ভাই বোন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

পৃথিবীতে কাহারও পরাক্রম চিরকাল থাকে না। অত্যাচারী মনে করে তাহার ক্ষমতা চিরদিনই সমান ভাবে থাকিবে, কিন্তু দুদিন যাইতে না যাইতেই সে ক্ষমতা কোথায় চলিয়া যায়। আগুন যখন ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন সে মনে করে সমুদায় পৃথিবীই তাহার উদরসাৎ হইবে, কিন্তু অল্পক্ষণে তাহার সে ভ্রম দূর হয়—মহা ক্ষমতাশালী ... রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর অতি তুচ্ছ ... ধ্য গণ্য হয়। সকলেই এই নিয়মের ব... সমুদ্র মহা পরাক্রমশালী হইলেও এ নিয়... অন্যথা করিতে পারে না, কারণ যিনি এ নিয়মের কর্ত্তা তাঁহার ক্ষমতার নিকট সমুদ্রের বল অতি তুচ্ছ। তাই আজ আর জলের সে আনন্দ ধ্বনি নাই—সে জয় শব্দ নাই। কাল যেখানে জলের তর তর শব্দ ছিল আজ সেখানে মানুষ এবং কুকুর বিড়াল প্রভৃতির মৃত দেহ রহিয়াছে। অত্যাচারীর পরাক্রম চিরস্থায়ী হয় না বটে কিন্তু লোকের অনিষ্ট করিতে পারে। তাই আজ সমুদ্রের অত্যাচারে সহস্র সহস্র জীবজন্তু প্রাণ হারাইয়াছে—পিতা মাতা, পুত্র কন্যা বিহীন হইয়াছে—ভ্রাতা ভগিনী চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—শত শত বালক বালিকা পিতা মাতা হীন হইয়া চিরদিনের জন্য অনাথ হইয়াছে। বৃক্ষ লতা পর্য্যন্তও এ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই—শত সহস্র বৃক্ষ লতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রের যে অবস্থা হয় আজ দৌলত খাঁর সেই অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এ যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধ হইতে অধিক ভয়ানক। এ যুদ্ধে কাহারও পরিত্রাণ নাই। মানুষ হইতে বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত সকলেই এ ভীষণ যুদ্ধে হত হইয়াছে। দৌলত খাঁ আজ ভীষণ শ্মশান—মানুষ যাহারা জীবিত ছিল তাহারা প্রেত ও পিশাচের আকার ধারণ করিয়াছে—লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বস্ত্র অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য দস্যুর ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ফিরিতেছে এবং মৃত কিম্বা অর্দ্ধ মৃতের শরীর হইতে পিশাচের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিতেছে। যে হতভাগ্য বা হতভাগিনী এখনও জীবনের আশা করিয়া সেই দস্যুদিগের নিকট জল চাহিতেছে তাহারা জলদানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু অস্ফুটস্বরে "মা" "বাবা" বলিয়া

কাঁদিতেছে, কিন্তু নরপিশাচদিগের হৃদয়ে তাহাতে বিন্দুমাত্রও দয়ার উদয় হইতেছে না। মানুষ কিরূপে পশু অপেক্ষাও অধম হইতে পারে তাহারা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কোথাও বা শিয়াল কুকুরে মৃত মাতার বক্ষঃস্থল হইতে মৃত কিম্বা প্রায় মৃত শিশুকে কাড়িয়া লইয়া আহার করিতেছে। যে মাতা জীবিত থাকিতে প্রাণান্তেও আপনার শিশুকে ছাড়িতেন না আজ তিনি বিনা আপত্তিতে আপনার স্নেহের পুত্তলিকে শেয়াল কুকুরের আহারের জন্য দিতেছেন। কোথাও বা কাক গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষী সকল কোটর হইতে মানুষের চক্ষু বাহির করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ নরনারী সকল বিকট ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বা মানুষ ও পশু পক্ষী একত্রে মৃত্যু শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। মৃত্যুর অধিকারে কাহারও প্রতি কাহারও ভয় বা বিদ্বেষ নাই। জীবিত থাকিলে যাহারা মানুষের আলয় হইতে শত যোজন দূরে থাকিত—মানুষ যাহাদিগকে ভয় বা ঘৃণা করিয়া কখনও তাহাদের নিকটে যাইত না—আজ তাহারা মৃত্যুর অনুগ্রহে সকলেই এক শয্যায় শয়ন করিয়াছে। আজ আর মান অভিমান নাই—ভেদাভেদ নাই। সকলেই ভাই ভাই—সকলেই এক পিতা মাতার সন্তান।

এ দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিবেন। অনেকেরই মনে হইবে "ঈশ্বরের কি অবিচার!" কিন্তু তাঁহাদিগকে একটী কথা ভাবিতে বলি। যদি এ সংসারে মন্দ না থাকিত এবং সকলেই ভাল হইত তবে কি ভাল বলিয়া একটা কথা থাকিত, না তাহার আদর থাকিত? যদি অন্ধকার না হইয়া প্রতিদিনই পূর্ণচন্দ্র উঠিত তবে কি চাঁদের আলোকে মানুষ এত আহ্লাদিত হইত? অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকের এত আদর—"মন্দ" আছে বলিয়াই "ভাল"র এত সম্মান। কেবল তাহাই নহে,—যখন অন্ধকারের ভিতর আলোক দেখা যায় তখন তাহা আরও উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। রাত্রি যত বেশী আঁধার হয়, নক্ষত্রের আলোক ততই অধিক উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। যখন লোকে দুঃখ ও দুর্দ্দশায় পতিত হয় তখনই তাহাদের সদ্গুণ সকল নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশিত হয়। চারিদিকে যখন অসৎ কাজ ও অসাধু ব্যবহার দেখিয়া অন্তঃকরণ ক্ষুব্ধ হয় তখন যদি ভাগ্যক্রমে কোন পুণ্য কর্ম্ম বা সাধু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে আর আনন্দের সীমা থাকে না। সে সৎকাজ সামান্য হইলেও অতিশয় মনোরম বলিয়া বোধ হয়। আর একটী কথা:—সংসারে কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা পাপ নাই। ঈশ্বরের এমনি ইচ্ছা এবং সুবিচার যে যাহা আমরা অতিশয় ঘৃণাজনক কার্য্য মনে করি তাহার মধ্যেও শিক্ষার বিষয় আছে—যাহা আমাদের নিকট ঈশ্বরের অবিচার বলিয়া বোধ হয় তাহাও আমাদের শিক্ষার জন্য। কোন কাজে তোমার আমার ক্ষতি হইতে পারে স্বীকার করি কিন্তু হয়ত তাহাতে পৃথিবীর শত সহস্র লোকের উপকার হইবে। আ[illegible]পর—নিজের সুখ লইয়া ব্যস্ত—তাই যে ব[illegible]রা অসুখী হই—যাহাতে আমাদের লালসা [illegible] না—তাহাতেই আমরা ঈশ্বরের অবিচার [illegible]রি। আমাদের বুদ্ধি অতি সামান্য—সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি না তাই মূর্খের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি। ঈশ্বরের রাজ্যে কোথাও অবিচার নাই—কোথাও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা পাপ নাই।

দৌলত খাঁর এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া একদিকে যেমন পৃথিবীকে নরক বলিয়া বোধ হয়, তেমনি

অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় "পৃথিবীই স্বর্গ—স্বর্গ বলিয়া অন্য কোন স্থান নাই।" যখন দেখা যায় যে জননী জলের স্রোতে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু তবুও বক্ষঃস্থিত শিশুকে পরিত্যাগ করেন নাই—শত সহস্র প্রবল তরঙ্গ তাঁহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে তবু সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই—জলের খরতর স্রোতে তাঁহার অপত্যস্নেহ ভাসিয়া যায় নাই—তখন কে বলিবে পৃথিবী স্বর্গ নহে? যখন দেখা যায় অদ্ধ মৃতা ভগিনী মৃতপ্রায় ভ্রাতার জন্য অতি কষ্টে জল আনয়ন করিতেছে—তখন কে বলিবে পৃথিবীর লোক কেবল আপনার স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত? এত মানুষের কথা;—দৌলত খাঁর সে প্রলয়ে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রতি আশ্চর্য্য ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। মহাদেবের আবাসস্থল কৈলাস ভবনের বর্ণনা পড়িয়াছি,—সেখানে পশু পক্ষী পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলেই শান্ত ভাবে বাস করে—বিড়ালে ইন্দুরে, সাপে ময়ূরে, একত্রে বন্ধু ভাবে থাকে। কৈলাস ভবনে কখনও যাওয়া ভাগ্যে ঘটে নাই সুতরাং সেখানকার কথা বলিতে পারি না কিন্তু ৮২ সালে দৌলত খাঁতে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা জানি। এক বৃক্ষের উপর মানুষ, সাপ এবং বাঘ একত্রে রহিয়াছে দেখা গিয়াছিল।

এ ভাবে দৌলত খাঁ অনেকক্ষণ রহে নাই। গভর্ণমেণ্ট হইতে যত শীঘ্র সম্ভব সাহায্য প্রেরিত হইয়াছিল। মৃতদেহ সরাইয়া দেওয়া হইল—অর্দ্ধ মৃত এবং কাতর যাহারা ছিল তাহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল—যাহারা জীবিত ছিল তাহাদিগকে খাদ্য এবং বস্ত্র দেওয়ার হুকুম হইল। জীবিতেরা আপনাদিগের ভ্রাতা ভগিনী, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যদিও গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি মড়ক নিবারণ হয় নাই। মৃত মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতির দুর্গন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইল এবং সে জন্য যাহারা জীবিত ছিল তাহাদেরও অধিকাংশ সংক্রামক রোগে প্রাণত্যাগ করিল।

এ সময়ে বসু বাবু এবং তাঁহার পুত্র কন্যা কোথায়? অনুসন্ধানে কিছুই ঠিক হইল না—পুলিসের রিপোর্টেও কিছু জানা গেল না। কেবল বসু বাবুর স্ত্রীর মৃতদেহ শিশুসন্তান বক্ষে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া পুলিষ কর্ম্মচারীরা অনুমান করিল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গেল না। শরীর ফুলিয়া বিকৃত হইয়াছিল—দস্যুরা হস্তপদ হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে তাহার চিহ্ন পাওয়া গেল—একটী শিশু ক্রোড়ে ছিল সে বসু বাবুর কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অনুমিত হইল। বসু বাবুর স্ত্রী হিন্দুকুল বধূ, কেহ কখনও তাঁহাকে দেখে নাই—দাস দাসী যাহারা ছিল তাহাদিগকেও পাওয়া গেল না।—সুতরাং পুলিষ কর্ম্মচারীরা অন্য উপায় না দেখিয়া অনুমানে কার্য্য শেষ করিলেন। বসু বাবু উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী—তাঁহার স্ত্রীর অনুসন্ধান হওয়াই চাই সুতরাং পুলিস ঠিক করিল সেই মৃতদেহই বসু বাবুর স্ত্রীর; এবং সেইরূপ রিপোর্ট প্রেরণ করিল। কিন্তু বসু বাবু ও তাঁহার পুত্র কন্যার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

ক্রমশঃ

আর্কিয়প্টেরিক্‌স্‌।

আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে ম্যামথের কথা বলিয়াছি। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে কত অদ্ভুত জীব জন্তু পৃথিবীতে ছিল তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত তাহাদের অস্থি কঙ্কালে টের পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব জন্তু পৃথিবীতে বাস করিত। এখন কেবল তাহাদের চিহ্নাবশিষ্ট রহিয়াছে। ভারতবর্ষেই নর্ম্মদাতীরে এত প্রকাণ্ড এক হস্তির মস্তক পাওয়া গিয়াছে যে অত বড় জীব পৃথিবীতে জন্মিয়াছিল কিনা আজও বলা যায় না।

তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এখন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে আমরা যত জাতের জীব দেখিতে পাই সেই সব গুলিই যে এইরূপ হইয়াই সৃজিত হইয়াছে এবং বরাবরই এইরূপ থাকে তাহা নহে। এক জাতীয় জীব কালক্রমে বংশ পরম্পরায় এত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ও পরবংশীয়দের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয় এবং তখন ইহারা যে এক জাতীয় তাহা আর বলা যায় না। এইরূপে এক জাতি হইতে অন্য জাতির উৎপত্তি হয়।

পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ সরীসৃপ। পাখীরা টিকটিকি গিরগিটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাই বলিয়া তোমরা মনে করিও না যে টিকটিকির ডিম ফুটিয়া একটা পাখী বাহির হইয়াছিল বা হইতে পারে।

হঠাৎ এরূপ রূপান্তর হয় নাই; অল্পে অল্পে অদৃশ্য রূপে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে। এবং এই প্রকারে রূপান্তরিত হইতে কত যুগ লাগিয়াছে কে বলিতে পারে? সরীসৃপ রূপান্তরিত হইয়াই যদি পাখী হইল তবে পাখী আর সরীসৃপের মাঝামাঝি কোন এক প্রকার জীব অবশ্য জন্মিয়াছিল। সেটা কি? এবং তাহার কি কোন চিহ্ন পাওয়া যায়? এই অদ্ভুত সরীসৃপ-পক্ষীর দেহের অল্পাংশ মাত্রই ১৮৬১ খৃঃ অব্দে বাভেরিয়া দেশের কোন গিরি প্রস্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহার প্রায় বার বৎসর পরে বোধ হয় সেই প্রদেশেই এই জীবের একটী সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়। এই পক্ষীর একটী প্রকাণ্ড লেজ আছে। লেজে কুড়িটী গাঁইট আছে এবং প্রত্যেক গাঁইটের দুই ধার হইতে দুইটী পালক বাহির হইয়াছে। পা দুখানি ঠিক পাখীর পা। ডানা দুখানিতে যে দুইটা পা আছে, তাহা ঠিক যেন সরীসৃপের পা। কোন পাখীরই দাঁত হয় না; কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি দাঁত আছে। মস্তিষ্ক পক্ষীর ন্যায়। ডানায় পায়রার পালকের মত পালক এবং পায়ে পাখীর লোমের মত লোম আছে। শরীর সরীসৃপের ন্যায়। শরীরের আর কোন অংশে পালক নাই। শরীর টিকটিকির ন্যায় চর্ম্মে আবৃত পালকগুলি বোধ হয় অতি সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত। চক্ষু সরীসৃপের চক্ষুর ন্যায়। এই পাখী কাকের মত বড় হইবে। ইহার নাম আর্কিয়প্টেরিক্স্ রাখা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বতন জীবেরা কিরূপ ছিল, কেনই বা ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইল কে বলিতে পারে? ইহা ত বহুদিনের কথা। এক শত বা দুই শত বৎসর পূর্ব্বের লোকেরা যে দুই একটা অদ্ভুত জীব দেখিয়া তাহার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; সেই জীব আর আমরা দেখিতে পাই না। তাহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইরূপে কত প্রকারের জীব এই পৃথিবীতে জন্মিল আর কতই লোপ পাইল। আরও কত নূতন প্রকারের জীব জন্মিবে কে বলিতে পারে?

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।

(১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম প্রথম সেলকার্ক নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত না হইলে কিছু খাইতেন না। তাহার কারণ প্রথমতঃ মানসিক কষ্ট, দ্বিতীয়তঃ রুটী লবণের অভাব। অপরিচিত স্থানে কখন কি বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত, জাগিয়া থাকা যখন সাধ্যাতীত হইত কেবল তখনই তিনি শয়ন করিতেন। পিমেণ্টো বৃক্ষের কাষ্ঠ তাঁহার অগ্নি ও প্রদীপের কার্য্য করিত। এই কাষ্ঠ জ্বালিলে কেবল যে পরিষ্কার আলোক উৎপন্ন হইত তাহা নহে, কিন্তু ইহা হইতে এক প্রকার সৌরভ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিত। তিনি মৎস্য বা মাংস কখন কেবল সিদ্ধ করিয়া, কখন বা উহার ঝোল প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। তিনি উক্ত দ্বীপে অবস্থান কালে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ ছাগল মারিয়া আহার করিয়াছিলেন এবং আর ৫০০ ছাগল ধরিয়া তাহাদের কাণে চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বদা

চলিয়া বা দৌড়িয়া আহার অন্বেষণ করিতে হইত বলিয়া তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি জঙ্গলের ভিতর ও পাহাড়ের উপর অসাধারণ বেগে দৌড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন।

লবণহীন মাংসে তাঁহার যে অরুচি ছিল তাহা ক্রমে চলিয়া গেল। তিনি যে জাহাজের কাপ্তেন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, সেই জাহাজের নাবিকেরা উক্ত দ্বীপে কতকগুলি শালগামের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিল। তাহা ক্রমে অনেক বিঘা ভূমির উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শীত কালে ঐ ভূমিতে শালগাম উৎপন্ন হইত তাহাও তিনি আহার করিতেন। এতদ্ভিন্ন ঐ দ্বীপে এক প্রকার কপি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং পিমেণ্টো বৃক্ষের ফল তাঁহার ব্যঞ্জনের মরীচের কার্য্য করিত। বনে দৌড়িতে দৌড়িতে ক্রমে তাঁহার পাদুকা ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে এবং পাদুকা নির্ম্মাণের উপায় না থাকাতে তিনি খালি পায়েই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাহাতে তাঁহার পায়ের চর্ম্ম এমন কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে তিনি অনায়াসে বিনা পাদুকায় পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত বেড়াইতে পারিতেন এবং ঐ দ্বীপ ত্যাগের পরে পাদুকা ব্যবহার করিলেই তাঁহার পায়ে বেদনা হইত। নির্জ্জন বাস-জনিত বিষাদের লাঘব হইলে পর তিনি অন্যমনস্ক হইবার জন্য নিজের নাম, ঐ দ্বীপে আসিবার দিন এবং কত দিন তিনি সেখানে আছেন তাহা গাছের গায়ে খুদিয়া বেড়াইতেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল জাহাজ কাষ্ঠ বা জল লইবার জন্য ঐ দ্বীপের নিকট নঙ্গর করিত তাহা হইতে যে সকল বিড়াল ও ইন্দুর দ্বীপে উঠিয়াছিল তাহাদের ক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে সেলকার্ককে প্রথম প্রথম বিড়াল ও ইন্দুরের উৎপাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাত্রে যখন ঘুমাইয়া থাকিতেন তখন ইন্দুরগণ তাঁহার পায়ে কামড়াইত ও তাঁহার পোষাক কাটিয়া ফেলিত। তখন তিনি বিড়ালগুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাহাদিগকে ছাগলের মাংস খাইতে দিতেন। ক্রমে তাহারা এমন পোষ মানিল যে রাত্রে তাঁহার চতুর্দ্দিকে শুইয়া থাকিত এবং ইন্দুর আসিলেই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত। এতদ্ভিন্ন তিনি কতকগুলি ছাগলকে পোষ মানাইয়াছিলেন। নির্জ্জনতার কষ্ট দূর করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে এই সকল পালিত ছাগ ও বিড়ালদিগকে লইয়া নৃত্যগীত করিতেন। এইরূপে ঈশ্বরের কৃপায় ও যৌবন কাল-সুলভ শারীরিক ও মানসিক বলের সাহায্যে তিনি শীঘ্রই নির্জ্জন বাস-জনিত অসুবিধা ও কষ্টের উপর জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেলে পর সেলকার্ক প্রেক দ্বারা ছাগচর্ম্ম সেলাই করিয়া একটী জামা ও টুপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সূতার অভাবে ছাগলের চামড়া ছুরি দিয়া সরু সরু ফিতার মত করিয়া কাটিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছুরি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে পর তিনি উপকূল হইতে নাবিকদিগের পরিত্যক্ত পিপার বেড়ের লৌহ লইয়া দুই খণ্ড প্রস্তরের সাহায্যে তাহা পাতলা ও ধারাল করিয়া ছুরির ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার সঙ্গে কতকগুলি সূতার কাপড় ছিল, পুরাতন মোজার সূতাও প্রেকের দ্বারা সেলাই করিয়া তিনি তাহা হইতে কতকগুলি কামিজ প্রস্তুত করেন। যখন আমাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন ঐ সকল কামিজের মধ্যে একটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ব্যবহারের অভাবে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা অনেক ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের জাহাজে আসিবার পর প্রথম প্রথম

তাঁহার কথা অনেক সময় বুঝিতে পারিতাম না। তিনি সকল কথা সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন; কারণ ঐ দ্বীপে অবস্থান কালে তিনি জল ভিন্ন অন্য কোনও পানীয় গ্রহণ করেন নাই, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি আমাদিগের রন্ধন করা খাদ্য আহার করিতে পারিতেন না। আমরা প্রায় এক পক্ষকাল সেখানে ছিলাম। সেই সময়ে তিনি জাহাজস্থ রোগীদিগের জন্য প্রত্যহ দুই তিনটী ছাগল ধরিয়া দিতেন। তিনি ঐ দ্বীপে কোনও বিষাক্ত বা হিংস্র জন্তু দেখেন নাই। বিড়াল, ইন্দুর ও ছাগল ব্যতীত অন্য কোনও পশু তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়ে নাই। জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ নামক এক ব্যক্তি আর কয়েকটী পরিবারের সহিত এই দীপে কিছুদিন ছিলেন। তিনিই প্রথমে এখানে ছাগল আনয়ন করেন। পরে চিলি দেশ আবিষ্কৃত হইলে তাঁহারা সেখানে চলিয়া যান। এই ব্যক্তির নাম হইতে ঐ দ্বীপকে জুয়ান ফর্ণাণ্ডেজ দ্বীপ বলা হয়।

পৃথিবীর পূর্ব্ব কথা।

আজ পৃথিবী বৃক্ষ লতা, ফল পুষ্প, নদী পর্ব্বতে সুশোভিত। আজ বনে ফুল ফুটিয়াছে, বৃক্ষশাখায় পাখী গান করিতেছে, মানুষ চেষ্টা এবং যত্নে পৃথিবীকে স্বর্গের নন্দন কানন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু চিরদিনই কিছু পৃথিবীর এ অবস্থা ছিল না; এবং বোধ হয় চিরদিন থাকিবেও না। আজ যাহা দেখিতেছ, পৃথিবীর জন্ম হইতেই এ সকল কিছু ছিল না। আজ আমরা সংক্ষেপে পৃথিবীর পূর্ব্ব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা সকলেই ভূগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে, কমলা লেবুর ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। তোমরা ইহাও জান যে, পৃথিবী ক্রমাগত ঘুরিতেছে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদ্বয় চাপা, এবং কটিদেশ স্ফীত, ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবী এক সময় তরল বস্তু ছিল। কারণ তরল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত একটা গোলাকার বস্তু যদি ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার উপর এবং নিম্ন দিক চাপা হইলেই তাহার মধ্যস্থান স্ফীত হইবেই হইবে। কারণ তরল পদার্থ নির্ম্মিত একটা গোলক যদি ঘুরিতে থাকে, তবে তাহার উপর এবং নিম্ন দিক হইতে পদার্থ সকল নামিয়া মধ্যদেশ স্ফীত করিয়া তুলিবে। সুতরাং পৃথিবী যে এক সময় তরল অবস্থায় ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পৃথিবী যেমন তরল অবস্থায় ছিল, তেমনি ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। সে কি ভয়ানক উত্তাপ তাহা মনেও ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যে উত্তাপে লৌহ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য তরল হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এ তেমনি উত্তাপ। পৃথিবী তখন ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত একটী বাষ্প গোলক মাত্র ছিল। কিন্তু পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতে লাগিল। যে শূন্যপথে পৃথিবী ঘুরিতেছে সেখানকার উত্তাপ অতি সামান্য; সুতরাং এই শীতল আকাশ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর উত্তাপ ক্রমে কমিতে

লাগিল। এই রূপে পৃথিবী ক্রমে যত শীতল হইতে লাগিল, সেই উত্তপ্ত বাষ্পরাশিও ক্রমে তরল হইতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল তাহা নহে, কতকটা সেই উত্তপ্ত অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল। এখন পর্যন্তও পৃথিবীতে এক বিন্দু জল নাই; এখনও আমরা সেই বাষ্পরাশি দ্বারা আবৃত, উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পৃথিবীর উত্তাপ যখন ক্রমে আরও কমিয়া আসিল, তখন সেই বাষ্প-রাশি আর বাষ্পাকারে থাকিতে পারিল না। সেই বাষ্পরাশি ঘন হইতে লাগিল এবং জল হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। কিন্তু এখানকার বৃষ্টির ন্যায় সে বৃষ্টিজল শীতল নহে, তখনকার পৃথিবীও যেমন ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ছিল, বৃষ্টিও তেমনি উত্তপ্ত, সুতরাং উষ্ণ বৃষ্টিজল উষ্ণ পৃথিবীর উপর পড়িবামাত্র আবার তাহা বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়া গেল। আবার শীতল আকাশের পাশে শীতল হইয়া আবার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িল। কতদিন এই ভাবে চলিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু অবশেষে উত্তপ্ত বাষ্প এবং উত্তপ্ত পৃথিবী যখন খুব শীতল হইয়া পড়িল, তখন জল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। তখন চারিদিকে কেবল জল, জল ভিন্ন আর কিছুই নাই। পৃথিবীর জীবনের সেই প্রথম যুগ। আমরা মামথ প্রবন্ধে এ যুগের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং মনুসংহিতায় ও পুরাণেও এই যুগের কথা লিখিত আছে।

পৃথিবী এ পর্য্যন্তও ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ক্রমে যখন ইহার বাষ্পাবরণ পাতলা হইতে লাগিল, তখন ক্রমে সেই অন্ধকারময় পৃথিবীতে সূর্য্য কিরণ দেখা দিল। এই সূর্য্যালোকই পৃথিবীর জীবন; এই সূর্য্যালোকই পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য্যের মূল কারণ; এই সূর্য্যালোকের জন্যই সেই জলমগ্ন পৃথিবীকে, বৃক্ষ লতা, ফল ফুল, নদী পর্ব্বতে শোভিত দেখিতেছি; এই সূর্য্যালোকের জন্যই পৃথিবী আজ মানুষের বাসের উপযোগী হইয়াছে, এবং এই সূর্য্যালোক না থাকিলে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তিও হইতে পারিত না।

পৃথিবী যে উত্তপ্ত বাষ্পাবরণে আবৃত ছিল, সেই উত্তপ্ত বাষ্পের মধ্যে লৌহ প্রভৃতি ধাতুও বাষ্পাকারে মিশ্রিত ছিল। ক্রমে যখন পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল, এবং সেই শীতলতার জন্য যখন সেই বাষ্পরাশি জলরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইয়া সমুদ্র উৎপন্ন করিল; তখন লৌহ প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতব পদার্থ বাষ্পাকারে ছিল, তাহাও বৃষ্টি জলের সহিত পৃথিবীর উপরে পড়িল। এই সকল পদার্থ রেণু ক্রমে সমুদ্র জলে থিতাইয়া থিতাইয়া স্তর গঠিত হইতে লাগিল। এবং সেই সকল স্তর ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দেশ মহাদেশের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হইল বটে, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ এখনও উত্তপ্ত এবং তরল রহিয়া গেল। ভিতরের এই অগ্নির প্রভাবে উপরের আবরণ যে স্থান ফাটিয়া ধাতু স্রোত নির্গত হইত, সেইগুলি ছোট বড় নানা প্রকারের পর্ব্বত হইয়াছিল।

পৃথিবীর উপরিভাগ পূর্ব্বেই শীতল হইয়া জমিয়া কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু ভিতরটা তত শীঘ্র শীতল হয় নাই। কালে যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ শীতল হইতে লাগিল, ততই ভিতরের তরল পদার্থ ঘন হইয়া বসিতে আরম্ভ করিল। তরল পদার্থ ঘন হইয়া জমিয়া কালে, আয়তনে ছোট হইয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর গর্ভস্থ তরল পদার্থ যখন জমিয়া কঠিন হইতে লাগিল, তখন আয়তনও কমিয়া গেল, কাজেই

পৃথিবীর উপরের আবরণটা অনেক স্থান তুবড়াইয়া এবং অনেকস্থান দমিয়া যাইতে লাগিল। এবং কোন কোন স্থান উচ্চ হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হইল। হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত এই রূপে সৃষ্টি হইয়াছে।

পৃথিবীর সেই বাল্যাবস্থায় যে সমস্ত দেশ মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সকল দেশ মহাদেশই যে এখন রহিয়াছে, তাহা নহে। কত হইয়াছে, কত গিয়াছে, আবার কত নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। নদীতে যে প্রণালীতে চর পড়ে, সেই প্রণালীতে সমুদ্রস্থ পদার্থ রেণু স্থিতাইয়া স্থিতাইয়া স্থানে স্থানে স্থল হইয়া উঠিল, আবার কোন স্থানের স্থল সমুদ্র বেগে ভাসিয়া যাওয়াতে সে স্থান পুনর্বার জলে পূর্ণ হইল। এই যে প্রকাণ্ড হিমালয়, ইহাও এক সময় সমুদ্র গর্ভে ছিল। এখন আমরা যে সকল দেশ মহাদেশ দেখিতেছি, এমন কত দেশ মহাদেশ নির্ম্মিত হইয়া আবার সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। আজ যে স্থানে ফল ফুলে, বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ সুন্দর উপবন সে স্থান একদিন সমুদ্র গর্ভে ছিল। আবার আজ যে স্থানে সমুদ্র দেখিতেছ এক সময় সে স্থান হয়ত একটী সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। এই পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে ক্রমাগত চলিতেছে। পৃথিবী কাল যাহা ছিল আজ তাহা নাই। আজ যাহা আছে কাল আবার তাহা থাকিবে না।

ফুলের সাজি।

একাদশ অধ্যায়।

সুখের দিন।

দীননাথ ও মনোরমা যে গ্রামে আশ্রয় পাইয়াছিল তাহার নাম গোপালপুর, তথায় দীননাথ ও মনোরমা কৃষক গৃহে বাস করিবার জন্য চিরন্তন বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। কৃষক পত্নী পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেকগুলি গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্য দিয়াছিল, এক্ষণে তাহাদিগকে আরও কিছু বাসন ও দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য কতকগুলি হাঁড়ি সরা প্রভৃতি প্রদান করিল। মনোরমা পুনর্বার মনের সুখে আপনারা রন্ধন করিয়া আহার করিতে পাইয়া বড়ই প্রীত হইল। দীননাথ ও মনোরমা এত দুঃখের পর আবার সুখী হইল। দীননাথ সাজি প্রস্তুত করিতে করিতে মনোরমার সহিত কত সুন্দর সুন্দর কথা কহিত। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষক গৃহের সকল পরিবার একত্র হইয়া বৃদ্ধ দীননাথের গল্প শ্রবণ করিতে ভালবাসিত। কৃষকের ঘরের রকে একটী মাদুর পাতা হইত তথায় মনোরমা, কৃষক তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্র কন্যা সকলেই উপবেশন করিয়া দীননাথের উপদেশপূর্ণ নানা প্রকার গল্প শুনিয়া পরম আনন্দিত হইত।

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইয়া বর্ষাকাল আরম্ভ হইল। কৃষকের বাড়ীর পশ্চাতে একখণ্ড পতিত জমি ছিল, কৃষক সময়াভাবে

তাহাতে কোন ফসলাদি জন্মাইতে পারিত না। দীননাথ কৃষককে বলিয়া তথায় একটী বাগান করিতে আরম্ভ করিল, সে মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার অগ্রে আনটী কোদলাইয়া বৃক্ষাদি পুঁতিবার উপযুক্ত করিল। জমির চারিদিকে সুন্দর করিয়া বেড়া দিয়া তন্মধ্যে এক স্থানে শাক সব্জীর বীজ ছড়াইল, অপর স্থানে বেল, মল্লিকা, যুঁই, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের গাছ সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পুঁতিয়া দিল। মনোরমার উপর এই সকল বৃক্ষের পরিচর্য্যার ভার অর্পিত হইল। দীননাথ বাগানের মধ্য দিয়া একটী পরিষ্কার পথ করিয়া তাহার দুই ধারে ইষ্টক গাঁথিয়া পথের উপর খোয়া ছড়াইয়া বাগানটী মনোহর করিল। মনোরমা ঐ পথের স্থানে স্থানে এক একটী লতামণ্ডপ প্রস্তুত করিল। দীননাথের সুরুচির বলে ও মনোরমার তদারকে অতি শীঘ্রই বাগানখানি অতি সুরমা হইল। নিকটস্থ গ্রাম সকলের মধ্যে এমন আর একখানি বাগান ছিল না। দীননাথের রোপিত আম, জাম, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছগুলিও ক্রমে সতেজ হইয়া নূতন নূতন পত্র ফেলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাগানটী মনোহারী শোভার আধার হইয়া উঠিল।

আবার উদ্যান কার্য্যে দক্ষ দীননাথ উদ্যানের কাজ পাইয়া পরম সুখী হইল। সে প্রসাদপুর নিজের বাগানে যেমন ফুল ও ফল হইতে আপন দুহিতা মনোরমাকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিত এখানেও সেইরূপ উপদেশ দিতে লাগিল। বাগানের প্রত্যেক ফল, পাতা বা ফুল হইতে দীননাথ আপনার উপদেশের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিত। বর্ষাকাল অতীত হইল,—একদিন মনোরমা নিকটস্থ কোন সরোবর হইতে কতকগুলি পদ্ম তুলিয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় এক ছড়া মালা গাঁথিয়া পিতাকে অর্পণ করিল। দীননাথ হাস্যমুখে মালা গ্রহণ করিয়া বলিল "মা! যে ভাল খোঁজে তাহার ভালই মেলে; মনোরমা, এই পদ্ম ফুল হইতে শিখিবার অনেক আছে। এই কাঁটার মধ্যে পদ্ম ফুল ফুটার সহিত আমাদের অবস্থার ঠিক তুলনা হয়। কে বিশ্বাস করিবে যে, আমরা এই নির্জ্জন পল্লীগ্রামে ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের মধ্যে আমরা এত সুখ ও আনন্দ লাভ করিব? স্থান যতই মন্দ বা সামান্য হউক না কেন, নিত্য সন্তুষ্ট ব্যক্তি তথায় বাস করিয়া কখন অসুখ অনুভব করেন না। তাই বলিতেছি মা মনোরমে, তুমি আরও বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতি হও তাহা হইলে কষ্টের মধ্যেও ভগবান তোমায় এমন সুখ প্রদান করিবেন যাহা কোন মনুষ্য অর্পণ করিতে বা গ্রহণ করিতে সমর্থ নাহে।"

নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকেরা গোপালপুরস্থ কৃষকের বাটীতে ধান্য ক্রয় করিতে আসিত, একদিন কোন কৃষক পত্নী আমাদের পরিচিত কৃষকের বাড়ীতে ধান্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে একটী ছেলে ছিল, সেই কৃষক পত্নী যখন ধান্য দেখিয়া ওজন করিয়া লইতেছিল তখন ঐ বালক পলাইয়া দীননাথের বাগানে প্রবেশ করিয়া একটী গোলাপ তুলিতে গেল। সে তাড়াতাড়ি যেমন ফুল লইয়া ছুটিয়া আসিবে অমনি একটা ইট পায় বাধিয়া পড়িয়া গেল—গোলাপ গাছের কাঁটায় তাহার গা ছিঁড়িয়া গেল। তাহার চীৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া তাহার মা এবং গৃহস্বামিণী তাড়াতাড়ি তথায় উপস্থিত হইল। দীননাথ ও মনোরমা প্রথমে একটী বালকের ক্রন্দন তৎপরে তাহাদিগকে ওরূপ শীঘ্র শীঘ্র যাইতে দেখিয়া কি হইয়াছে জানিবার জন্য তাহাদের

পশ্চাতে পশ্চাতে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া দেখে বালকের গা কাঁটায় ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতেছে এবং বালক "এমন খারাপ গাছ দেখি নাই; গাছে আমার গা চিরিয়া গেল, দুষ্ট গাছ" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

মনোরমা তাড়াতাড়ি এক ঘটী ঠাণ্ডা জল আনিয়া বালকের চক্ষে মুখে দিল, এবং ক্ষত স্থান গুলির উপর তৈল মাখাইয়া দিল। কতক সুস্থ হইলে তাহারা বালককে লইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিল এবং মনোরমা আপনার গৃহ হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া বালকের হস্তে দিল। এইরূপে ঐ বালক কতক ঠাণ্ডা হইলে বৃদ্ধ কহিল—"বালকের এই ফুল তোলা ও কষ্ট দেখিয়া আমার একটী কথা মনে উঠিতেছে। বালক যেমন ফুলের লোভে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল অনেকেই পার্থিব সুখের প্রলোভনে পড়িয়া সেই রূপ দিক বিদিক জ্ঞানহারা হয়। গোলাপ যেমন কণ্টকাবৃত বৃক্ষে জন্মে, পার্থিব সুখ সম্পদের চারিদিকও সেইরূপ বিপদাকীর্ণ। বালকের ন্যায় অনেক অজ্ঞান লোক এই সুখ লাভ করিতে গিয়া বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং যে সুখের লোভে পড়িয়া বিপদগ্রস্ত হয় তাহারই নিন্দা করিতে থাকে। ভগবান আমাদিগকে যে সদ্বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন আমরা যদি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের পদে পদে বিপদ হইবার সম্ভাবনা"।

আর একদিন প্রভাতে মনোরমা বাগানে উপস্থিত হইয়া দেখে তাহার সাধের সূর্য্যমুখী গাছগুলির মধ্যে একটী গাছে ফুল ফুটিয়াছে। গোপালপুরে তাহাদের প্রতিবেশী কেহ কখন এ ফুল দেখে নাই। দীননাথ দূরস্থ গ্রাম হইতে বীজ আনিয়া এই গাছ জন্মাইয়াছিল। মনোরমা প্রতিবেশী ও কৃষকের বাড়ীর সকলকে এই ফুল দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে বাগানে ডাকিয়া আনিল। তাহারাও ফুল সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের গৃহস্বামিণী অপরাপর সকলকে কহিল—"দেখ দেখ ফুলটী যেন সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, শুনিয়াছি যে দিকে সূর্য্য ফিরিবে ফুলও সেই দিকে ফিরিবে। সকাল বেলা সূর্য্য পূর্ব্বদিকে থাকে ফুলও পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে, দুপর বেলা সূর্য্য যেমন মাথার উপর থাকিবে ফুলও উর্দ্ধ মুখ হইবে, আবার বৈকালে সূর্য্য পশ্চিম দিকে যাইলে ফুলও পশ্চিম দিকে ফিরিবে, এইজন্য ইহার নাম সূর্য্যমুখী"। দীননাথ কহিল "ঠিক বলিয়াছ, কিন্তু যে মানুষের মন সর্ব্বদা এই ফুলের মত ভগবানের দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে সেই ধন্য। আমরা যেন সুখে, দুঃখে, বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে কেবল হরির মুখ পানে চাহিয়া থাকিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সকল ক্লেশ দূর হইবে। মনোরমে, আমার এই কথাগুলি মনে রাখিও।"

কৃষক কহিল—"আহা ইহার গাছটি যদিও সরু তবুও কেমন সোজা ভাবে দাড়াইয়া আছে।"

দীননাথ উত্তর করিল "এই গাছ একটী অঙ্গুলির ন্যায় আমাদিগকে স্বর্গের দিকে দেখাইয়া দিতেছে—প্রতি পল্লীগ্রামে চাষাদের বাগানে এরূপ গাছ থাকা ভাল—কারণ আমরা প্রায়ই সংসারের কাজে ভগবানকে ভুলিয়া যাই। এই ফুল আমাদিগকে স্বর্গ, ঈশ্বরের কথা মনে করাইয়া দিতে পারে। আরও দেখ, ছোটই হউক আর বড়ই হউক, যত প্রকার গাছ বা লতা আছে সকলেরই উর্দ্ধ দিকে গতি। এমন কি লতাগুলি আপনি উঠিতে পারে না বলিয়া অপর কোন বৃক্ষ বা বস্তুর আশ্রয় লইয়া উপরের দিকে উঠে। মাধবী, মালতী প্রভৃতি লতাকে এইরূপে উপরে উঠিতে তোমরা

অনেকে দেখিয়াছ। এই সব স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত দেখিয়া এবং সকলের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন হইয়া আমরা যদি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভগবানের দিকে লক্ষ্য না করি এবং নীচ বাসনার দাস হইয়া নীচ পার্থিব সুখে মনকে আবদ্ধ করি তাঁহা হইলে আমাদের ন্যায় কৃপাপাত্র আর কেহ নাই। সেই জন্য এস ভাই, আমরাও আমাদের মনকে উচ্চ বিষয়ে নিযুক্ত করি,—হরির চরণ চিন্তা ভিন্ন এখন আর কিছু নাই, এবং নীচ কামনা সকল একবারে ভুলিয়া যাই। গাছেরা যেমন যেদিকে রৌদ্র সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে আমরাও সেই-রূপ যেন সদা হরির কৃপা পাইবার জন্য আকুল হই।" দীননাথের কথায় উপস্থিত সকলেই বড় আনন্দ বোধ করিল এবং তাহার উপদেশে তাহাদের ক্রমে ক্রমে জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইতে লাগিল। যেমন অগ্নির স্পর্শে অন্য পদার্থ ও অগ্নিময় হইয়া যায়, সাধু দীননাথের সংবাসে ক্ষুদ্র গ্রাম গোপাল-পুরের অধিবাসীগণও সাধুতা ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিল। দীননাথ এবং মনোরমাও গোপালপুরে সরল হৃদয় কৃষককবর্গ ও কৃষক বণিতাগণ দ্বারা পরি-বৃত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল এবং প্রসাদপুরের কষ্টের কথা ভুলিয়া আবার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইল।

যাঁহাদের হৃদয় পবিত্রতা ও শান্তির নিকেতন, যাঁহারা বিশুদ্ধ বিবেকযুক্ত ও নিষ্পাপ এবং যাঁহারা হরির চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা যতই কেন সামান্য স্থানে বাস করুন না, যতই কেন দরিদ্র হউন না কেন, তাঁহাদের ন্যায় সুখী ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই।

ফুলের সাজি প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

তীতুমীর।

"নারিকেলবেড়ের তীতুমীর বুজরুগি করিল,
যত সব মিঞা মোল্লা,
বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গী বাদসার সাথে লড়াই জুড়িল।"

তীতুমীরের লড়াইয়ের কথা তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। আমরা বাঙ্গালী —লড়াইয়ের ধার ধারি না, বাঙ্গলা সংবাদপত্রে লড়াইয়ের কথা লইয়া মহা আন্দোলন, এবং লড়াইয়ের মস্ত মস্ত বিবরণ দেখিতে পাও বলিয়া মনে করিও না, বাঙ্গালীর কোন পুরুষে লড়াই করিয়াছে, বা সেই বাঙ্গলা সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, লড়াই জিনিসটা কি তাহা কোন দিন চক্ষে দেখিয়া-ছেন। কিন্তু সে কথা থাক্। আমাদের কোন পুরুষে কেহ লড়াই না করিলেও, এবং আমরা জীবনে কখনও লড়াই কি তাহা না দেখিলেও, ছেলেবেলা হইতে তীতুমীরের লড়াইয়ের কথাটা শুনিয়া আসিতেছি. এবং আর অন্ততঃ সত্তর বৎ-সর পূর্ব্বেও যদি জন্মিতাম তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলে লড়াইটা স্বচক্ষেই দেখিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। আমরা তীতুমীরের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি।

চব্বিশ-পরগণার মধ্যে বসিরহাট একটী সবডি-ভিসন। সেই সবডিভিসনে নারকেলবেড়ে নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই নারকেলবেড়ে গ্রামে তীতুমীরের বাসস্থান ছিল। তীতুমীরের

বাল্যকালের কথা বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। মক্কা মুসলমানদের প্রধান তীর্থ স্থান। তীতুমীর তীর্থ করিতে মক্কায় যায়। সেখানে ওহাবীদিগের নেতা সৈয়দ আহাম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়; সৈয়দ আহাম্মদের নিকট তীতুমীর তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তীতুমীর ওহাবী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করে। ওহাবীগণ অতিশয় তেজস্বী এবং ইহাদিগের মধ্যে একতা অত্যন্ত অধিক; ইহারা একজনের জন্য আর একজন অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। সুবিধা হইলে আমরা ওহাবীদিগের কথা পরে বলিব। তীতুমীর ওহাবী ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেকেই তাহার শিষ্য হইল। ২৪-পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এই তিন জেলার তিন চারি সহস্র লোক তীতুমীরের শিষ্য হইল। সুতরাং তীতুমীর ক্রমে এক জন বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিল। তীতুমীরের শিষ্যেরা দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিত। কথিত আছে হিন্দু জমিদারেরা এই দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখার জন্য তীতুমীরের শিষ্যদিগের প্রতি জনের শ্মশ্রুর উপর পাঁচ সিকা কর নির্দ্ধারিত করিয়া তাহা আদায় করিতে চেষ্টা করেন; এবং এ ছাড়া অন্য প্রকারেও ইহাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তীতুমীরের লড়াইয়ের মূল এই। হিন্দু জমিদারদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের জন্য তীতুমীরের শিষ্যেরা স্থানে স্থানে বিদ্রোহী হইতে লাগিল। এবং এই উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে প্রতিদিন তুমুল বিবাদ হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওহাবীদিগের মধ্যে একতা অত্যন্ত অধিক। চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর এই তিন জেলায় তীতুমীরের যত শিষ্য ছিল, সকলেই তাহাদের গুরুর আজ্ঞায় একত্রিত হইল এবং পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই তিন জেলার প্রায় তিন চারি সহস্র মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং দেশ মধ্যে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। ইহাদিগের দল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং লুঠ ও চাঁদা দ্বারা বিদ্রোহীগণ অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিল। ইহারা যে কেবল হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহা নহে; যে সকল মুসলমানেরা ইহাদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিত তাহাদিগের উপরও ইহারা ঐরূপ অত্যাচার করিত। ক্রমে তীতুমীর এবং তাহার শিষ্যগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল; এবং অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ২৩এ অক্টোবর নারকেলবেড়ে গ্রামে তাহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করে, এবং বাঁশের দ্বারা একটী দৃঢ় দুর্গ ঐ গ্রামে নির্ম্মাণ করে। এই সময় ইহারা প্রচার করিতে থাকে যে, ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইয়া আবার মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইল। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, ঐ সালের ৬ই নবেম্বর নারকেলবেড়ের দুর্গ হইতে পাঁচ শত অস্ত্রধারী তীতুমীরের শিষ্য, নিকটস্থ একটী নগর অক্রমণ করে। ঐ নগরের দেবালয়ের পুরোহিতকে বধ করিয়া দুইটী গরু হত্যা করিয়া, সেই গো-রক্তে হিন্দুদের-মন্দির কলঙ্কিত করে, এবং দেব মূর্ত্তির সম্মুখে গরুর দেহ ঝুলাইয়া রাখে। এই প্রকার অনবরত অত্যাচার চলিতে লাগিল। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক হিন্দুর বাস সেই সকল স্থানে গিয়া গোহত্যা প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রকার অত্যাচার করিত, হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিলে, তাহাদিগকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিত, এবং সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া গ্রামখানি দগ্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত।

বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারের কথা গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন। প্রথমে জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ

তীতুমীর এবং তাহার শিষ্যদিগকে দমন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না, ক্রমে ইহারা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৪ই নবেম্বর একদল সৈন্য বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হয়। এই সৈন্য দলের অধিপতি ভাবিয়াছিলেন, সশস্ত্র ইংরেজ সৈন্য দেখিয়া এবং বন্দুকের আওয়াজে ভীত হইয়াই, বিদ্রোহীগণ পলায়ন করিবে বা আত্ম সমর্পণ করিবে। এই জন্য এবং বৃথা কতকগুলি লোকের জীবন বধ করিবেন না মনে করিয়া, সৈন্যদিগকে কেবলমাত্র বারুদ পুরিয়া বন্দুকে আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন। বন্দুকে গুলি ছিল না—সুতরাং ফাকা আওয়াজে তাহাদের কোন ক্ষতিই হইল না। ইংরাজ সৈন্য বন্দুক আওয়াজ করিলে, বিদ্রোহীগণের কাহারও কিছু হইল না দেখিয়া বিদ্রোহীগণ আরও উল্লসিত হইয়া উঠিল। তীতুমীর তখন সদর্পে বলিয়া উঠিল "গুলি খা ডালা" অর্থাৎ গুলি খাইয়া ফেলিয়াছি। শিষ্যবর্গ তীতুমীরের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ইংরাজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া বিপক্ষের সমস্ত সৈন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ১৭ই নবেম্বর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইহাদিগের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও অনেকেই বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইল, কতক পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

গবর্ণমেণ্ট এখন বুঝিলেন, সহজে বিদ্রোহীদিগের দমন হইবে না। তখন একদল দেশীয় পদাতিক সৈন্য, কতকগুলি গোলন্দাজ ও এক দল ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইল। তীতুমীর এবং তাহার অনুচরবর্গ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ময়দানে যুদ্ধ সজ্জায় দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজ সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুইবার যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, তাহাদিগের আশা এবারও তাহারা জয়ী হইবে। পূর্ব্বদিন যুদ্ধে যে সকল ইংরাজের প্রাণবধ করিয়াছিল আজ তাহাদিগের মৃতদেহ আপনাদের সম্মুখে জয় পতাকার ন্যায় রাখিয়া দিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল; চিরদিন কাহারও সমান যায় না, ভাগ্যলক্ষ্মী আজ তীতুমীরকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজকে আশ্রয় করিলেন। বিদ্রোহীগণ হতবল হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল। ইংরাজ সৈন্য সবলে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া, দুর্গ অধিকার করিল। এই যুদ্ধেই তীতুমীরের মৃত্যু হইল। এবং যুদ্ধের অবসানে সেই অসংখ্য বিদ্রোহীদিগের তিন শত পঞ্চাশ জন মাত্র জীবিত ছিল। ইহাদিগের এক শত চল্লিশ জনের কারাদণ্ড হয় এবং তীতুমীরের সেনাপতির প্রাণ দণ্ড হয়।

একটা গল্প।

রেশ গল্প শুনিবার জন্য রোজ তার দাদা মশাইকে বড বিরক্ত কবিত। বুড দাদা মশাই বড় ভাল মানুষ ছিলেন তাই পবেশকে বোজ গল্প শুনাতেন। সে দিন পবেশেব বাডী নবীন আর সুবেণ গিয়া হাজিব হইয়াছিল আব দাদামশাই এই গল্পটী তাদেব কাছে বলিলেন। এই বেলা তোমা-দেব ব'লে রাখি যে, নবীন আর সুরেণ বডই দুষ্ট ছেলে। লেখা পডা ত কিছুই কবে না, আব কেবল দুজনায় মাবামাবি কবে। তাই দাদা মশাই জানিতে পেবে এই গল্পটী বল্লেন।

"নবীন পরেশ আব সুবেণ তোমরা শোন, হ'রে আর যেদো দুই বন্ধু ছিল। তাবা এক স্কুলে পডিত, আর এক পাডায় থাকিত। বন্ধুত্বটা কিন্তু বড়ই আঁটাআঁটি ছিল, শুনছ সুবেণ আব নবীন। বন্ধু-তাব এতই জোঁর টান যে, সুবেণ যদি রাস্তাব ডান ধাব দিয়া যায় আর নবীন বাঁ দিক দিয়া যায়,

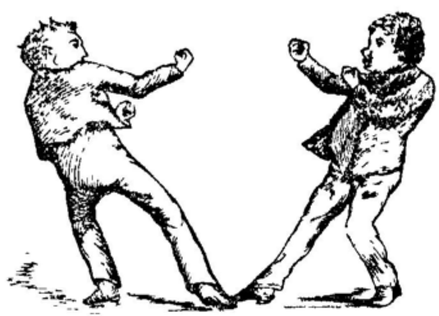

দুজনে দেখা হয়েছে কি সেই টানের চোটে বাস্তার মাঝখানে এসে পডেছে। (চিত্র দেখ) রাস্তার মাঝখানে এসে তাদেব বন্ধুত্বটা এইরূপে দেখাত।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বন্ধুতা দেখিয়ে স্কুলে যাইত। পণ্ডিত মশাই সব টের পাইলেন। তিনি পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের অনেক খাওয়া-ইতেন। খাবার জিনিষের আর কত নাম বলব—চড, কিল, চাবুক ইত্যাদি। কিছুতেই তাদের কিছু হয় না। এক দিন এইরূপে তাদের বন্ধুতার শেষ হয়। সের আলি জমাদার রাস্তার পাহারা দিতে আসিয়াছিল সে কি জানি কি

করে তাদের কি কল্ল। (২য় চিত্র দেখ) সে দিন থেকে তারা দেখা হলে আর রাস্তার মাঝে আসিত না। সুরেশ আর নবীন লজ্জিত হইয়া তখনি বাড়ি চলিয়া গেল। পরেশ ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

কুকুরের বুদ্ধি।

কুকুর বিড়ালের গায়ে সময়ে সময়ে ছোট ছোট কীট জন্মে তা তোমরা দেখে থাকবে। একটা কুকুরের ঐরূপ হইযাছিল। বেচারির বড়ই কষ্ট, সে না পারে ঘুমাতে না পারে দুদণ্ড স্থির হয়ে বস্তে। অবশেষে সে এক কৌশল ক'রে ঐ কীটের যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পায়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের স্বভাব এই যে, তাহারা জলে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, কুকুর ভায়া এই স্বভাবের সুবিধা লইয়া একদিন জগন্নাথ ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে জলে ল্যাজ ডুবাইয়া বসিল, ক্রমে যত জোয়ার বেশী হয় তার শরীরও তত জলে ডুবে। শরীরের যে অংশ জলে ডুবে কীটেরা সে অংশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে শুষ্ক অংশে আশ্রয় লয়, এইরূপ চলিতে লাগিল। অবশেষে কুকুরের সমস্ত শরীর জলে ডুবিয়া গেল কেবল নাকের অগ্রভাগ জাগিয়া রহিল। বুদ্ধিমান কুকুর মুখে করিয়া খানিকটা তুলা লইয়া গিয়াছিল, কীটেরা কুকুরের শরীরে আর আশ্রয় না পাইয়া ঐ তুলাতে আশ্রয় লইল। কুকুর যেই দেখিল আর একটা কীটও তার শরীরে নাই অমনি ফুঁদিয়ে তুলা দূরে ভাসাইয়া দিয়া "বাঁচিলেম" বলে উঠে দৌড় মারিল।

ধাঁধা।

এপ্রেল মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। লতা।

নূতন।

১। চিরদিন হিন্দুগণ ঘৃণা করে মোরে;
কিন্তু যবে রাখি আমি লাঙ্গুল বাহিরে,
তখন সাদরে তারা করিয়ে গ্রহণ
চূর্ণ করি দেহ মোর করয়ে ভক্ষণ।
মাথা খেয়ে, অকৃতজ্ঞ জীব জন্তুগণ
আমাতেই বাস করে আনন্দিত মন।

২। অতিশয় নম্র আমি মৃত্তিকা সমান
সুমিষ্ট কতই দ্রব্য নরে করি দান।
কিন্তু এক অপরূপ আছে মম রীত
মাথা না কাটিলে কভু আসে না সংগীত,
মস্তক পদেতে যবে হয় সম্মিলন
জল মধ্যে বাস করি মূরতি ভীষণ।
নদীতে সমুদ্রে আমি সর্ব্বত্র সমান।
দাড়ি-মাঝি মোর ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণ।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। একাদশ সংখ্যা

নবেম্বর, ১৮৮৮।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

সখার পাঠক, পাঠিকা, তোমরা অনেকগুলি বড় লোকের জীবন-চরিত পড়িয়াছ। আজ তোমাদের কাছে এক মহাত্মার জীবন-চরিত বর্ণনা করিব, যাঁহার নাম তোমরা বোধ হয় অনেকেই শুন নাই কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রকৃত বড় লোক। অনেক প্রকারের বড় লোক আছেন, কেহ রাজ-নীতিজ্ঞ, কেহ যোদ্ধা, কেহ দেশ হিতৈষী কেহ বা ধর্ম্ম-প্রচারক। তোমরা মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির জীবন চরিত পড়িয়াছ, ইহাঁরা ধর্ম্মের জন্য বড়। যে মহাপুরুষের কথা বলিব ইনিও এই শ্রেণীর বড় লোক। তোমরা হয়ত পুস্তকে বা লোকের মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার অলৌকিক ভাব, ও ঈশ্বর ভক্তির কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়, মন অপূর্ব্ব ভাবরসে অভিষিক্ত হয়, চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বাহির হয়, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি ঠিক চৈতন্যের ন্যায় ঈশ্বরভক্ত এবং তাঁহারই ন্যায় ভাবুক। অনেকে স্বচক্ষে ইহাঁর ঐশ্বরিক ভাব দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিয়াছেন। সহজ সহজ কথায় কঠিন ধর্ম্মকথা সকল এমন পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতেন যে বালক ও মহিলাগণ অবাধে তাহা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তি সকল ঈশ্বর সাধকদিগের বড় আদরের বস্তু।

১৭৫৬ শকে ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলি জেলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগে শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে এই মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, তিনি পরম তাপস ও সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। বালক রামকৃষ্ণ অতিশয় চঞ্চলমতি ছিলেন। বাল্যকালে বোধ হয় পাঠশালায়

লেখা পড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু একটু বয়স হইলেই আর পাঠশালায় বা টোলে পড়িতে যান নাই। তিনি বলিতেন, "আমি দেখিতাম যত ভট্টাচার্য্য টোলের ছাত্র পূজা করিয়া চাউল কলা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, মনে করিতাম টোলে পড়িয়া ত এই হইবে, আমার এমন পড়ায় কাজ নাই।" ছেলেবেলায় তিনি আপনি কৃষ্ণ সাজিয়া বালকদিগকে শ্রীদাম, সুবল, সাজাইয়া খেলা করিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে অল্পে অল্পে ধর্ম্মভাব স্থান লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিলে তিনি তাহা ছিন্ন করিয়া কোপিন করিয়া পরিধান করিতেন। তিনি বালক অবস্থায় এমন চিত্র করিতে ও ঠাকুর গড়িতে পারিতেন যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হইত। এমন কি চিত্রকর বা কুম্ভকারগণ কোন পট বা ঠাকুর প্রস্তুত করিয়া তাহা ঠিক হইল কি না তাঁহার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইত। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিশক্তি ছিল। যাহা একবার শ্রবণ করিতেন বা যাহা একবার কেহ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিত তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না। তিনি উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ কিছুই নিজে পাঠ করেন নাই কিন্তু শ্রবণ করিয়া ঐ সমস্ত পুস্তকের বিষয় সকল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের কূট প্রশ্ন সকল তিনি বলিবা মাত্র বুঝিতে পারিতেন। ১২।১৩ বৎসর বয়ক্রম কালে কলিকাতার অন্তঃপাতী ঝামাপুকুর নামক স্থানে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চতুষ্পাঠিতে আসিয়া তিনি কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কিছুদিন পরে জানবাজারের খ্যাতনামা রাণী রাসমণি কলিকাতার দুই ক্রোশ উত্তর দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বিস্তর অর্থব্যয়ে গঙ্গার ধারে একটী কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই কালী পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হন। কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণও তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ীতে বাস করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু বাহিরে কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় নাই।

দুই বৎসর পরে তাঁহার ভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যু হইলে তিনি কালীর নিত্য পূজা করিতে নিযুক্ত হন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৬ বৎসর তখন হুগলি জেলাস্থ জয়রামবাটী গ্রাম নিবাসী রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর তিনি স্বদেশ হইতে আবার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে আগমন করিয়া নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি চিরদিন গৃহে থাকিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ করিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে জানে? যাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবে না তাহাকে তিনি তাহা করান। পরমহংস বলিয়াছিলেন—"আমার প্রথমে খুব ইচ্ছা ছিল গৃহধর্ম্ম পালন করি, কিন্তু জানিনা কোথা হইতে এক ঝড় আসিয়া আমার মন ওলট্ পালট্ করিয়া দিল।"

তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, স্ত্রীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না। যখন তাঁহার স্ত্রী বালিকা তখনই তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য এবং ভগবানে গাঢ় অনুরাগ স্থাপিত হয়। তিনি বলিতেন কামিনী, কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র ও অর্থলালসা হইতে মনকে মুক্ত না করিলে ঈশ্বর লাভ করা যায় না। সেই জন্য তিনি আপন স্ত্রীকে কখনও পত্নীভাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেন, "টাকায় ভাত কাপড়, ভাল বাড়ী, গাড়ী

হয়, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না।” মাটী ও টাকা তাঁহার নিকট সমান ছিল। তিনি এক দিন এক হস্তে মাটী ও অপর হস্তে টাকা লইয়া মনে মনে বিচার করিলেন মাটী এবং টাকা একই পদার্থ, যেমন মাটী সচ্চিদানন্দ দিতে পারে না, টাকাও তেমন সচ্চিদানন্দ দিতে পারে না অতএব “মাটী টাকা, টাকা মাটী” এইরূপে মাটী ও টাকা গঙ্গা সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি কখন টাকা পয়সা হস্তে করিতে পারিতেন না, কেহ দেখিবার জন্য তাঁহার হস্তে টাকা ছুঁয়াইলে অঙ্গুলিগুলি আড়ষ্ট হইয়া যাইত। কি অদ্ভুত ত্যাগ!

রামকৃষ্ণের এইরূপ আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রীতি দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা বাবু মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের তাঁহার প্রতি অতিশয় ভক্তি হয়। মথুর বাবু তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন কালী বাড়ীর ভৃত্যেরা গিয়া তাঁহাকে বলিল যে, ভট্টাচার্য্য (তখন পরমহংসদেবকে সকলে ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকিত) কালীর মস্তকে ফুল চন্দন না দিয়া আপন মস্তকে দিয়া কালীর বেদীর উপর বসিয়াছেন। মথুরানাথ বাবু বলিলেন তিনি সামান্য লোক নহেন, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিবে না তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেন। মথুর বাবুই তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কালী পূজা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য তৎকার্য্যে নিযুক্ত হন। মথুর বাবু কালীবাটীস্থ একটী অট্টালিকার উপরে তাঁহাকে বাস করিতে দেন এবং তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত তখনই তাহা প্রদান করিতেন। মথুর বাবু কখন বা তাঁহাকে জানবাজারস্থ বাটীতে লইয়া যাইতেন এবং তিনি অন্দরমহলে পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে লজ্জা করিত না। মথুর বাবু তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি রামকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সংযম হইয়াছে কি না তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অধিকাংশ সময় বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া অবস্থান করিতেন, এবং কালীবাটীর উদ্যানে গঙ্গাতীরে তিনি স্বহস্তে পঞ্চবটী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর সাধনা করিতেন। তাঁহাকে অনেকেই বাতুল মনে করিত, কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য তাঁহার সেবা করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। সে সময়ে তিনি তাঁহার শরীরের তত্ত্বাবধারণ না করিলে সে কঠোর তপস্যায় দেহ রক্ষা হইত কি না সন্দেহ। তপস্যা করিয়া তাঁহার সুন্দর কান্তি মলিন এবং দেহ অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিল। এই প্রকার কঠোর সাধনায় প্রায় ১০।১১ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। সাধনার সকল কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, বলিলেও তোমরা বুঝিবে না। তাঁহার জীবনের চুম্বক কথাগুলি মাত্র বলিয়া যাইব।

যত দিন তাঁহার ইষ্ট লাভ হয় নাই তত দিন তিনি নিতান্ত ব্যাকুলভাবে দিন যাপন করিতেন। যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি “দিন ত গেল, আমার ত কিছুই হইল না” এই বলিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেন। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তিনি এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, যখন যাহা মনে হইত যে ইহা করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে তিনি অনন্যমনা হইয়া তাহাই করিতেন।

তোতাপুরী নামক একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসীর নিকট হইতে তিনি বেদান্ত শ্রবণ এবং তৎসম্বন্ধীয় সাধনাদি শিক্ষা করেন। ইনি ক্রমিক এগার মাস রামকৃষ্ণকে শিক্ষা দান করেন। যখন গুরু

দেখিলেন যে তিনি শিষ্যকে আর অধিক শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না এবং শিষ্য তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন তখন তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যান। শুনা যায় রামকৃষ্ণকে তোতাপুরীই "পরমহংস" উপাধি প্রদান করেন। পরমহংসদিগের যে ভেক থাকে তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না।

এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া তাঁহাকে সমগ্র তন্ত্র বিদ্যা শিক্ষা দান ও সাধনা করান। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইনি প্রথমে রামকৃষ্ণের ভাব বাতুলতা নয় বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করেন এবং বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থ হইতে তাঁহার ভাবের সহিত চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাভাবের ঐক্য আছে সকলের নিকট প্রদর্শন করেন।

পরমহংস সিন্দুরিয়াপটী নিবাসী দাতা শ্রেষ্ঠ ৺শম্ভুচরণ মল্লিকের নিকট বাইবেল গ্রন্থ শ্রবণ করেন। শম্ভু বাবু রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং বরাহনগরস্থ বাগানে আসিলে তাঁহাকে কালীবাটীর উদ্যান হইতে আনিয়া তাঁহার নিকট শ্যামা বিষয় শ্রবণ করিতেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যা চর্চ্চা করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার বেশ তালবোধ ছিল—এমনি সুমধুর রামপ্রসাদী ও অন্যান্য শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত করিতে পারিতেন যে, শ্রোতামাত্রেরই অন্তরে তাহা বিদ্ধ হইত। সে মোহন গীত যে একবার শুনিত সে আর তাহা ভুলিতে পারিত না। তাঁহার স্বভাব বালকের ন্যায় ছিল। আহার, নিদ্রা, কথা, হৃদয় সমস্ত বালকের ন্যায়—এমন সরলহৃদয় লোক সচরাচর দেখা যায় না; যাহা মনে করিতেন তাহা অকপটে বলিতেন। বালক ও অপরিণত বয়স্ক যুবাদিগকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন যাহারা বিষয় ভোগ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ধর্ম্ম কথা কহে সত্য কিন্তু তাহা কেবল মৌখিক, ভিতরে বিষয় চিন্তায় পোরা, যেমন পায়রাগুলা মুখে বক্ বকম্ করে বটে কিন্তু গলার ভিতর মটর গিজ্‌গিজ্ করিতেছে। কোন সুলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ যাহারা সত্যবাদী ও ঈশ্বরভক্ত এমন কোন বালক দেখিলে তিনি কত আদর করিতেন; তাহাদিগকে কত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেন। যাহাতে তাহারা চিরকাল সচ্চরিত্র থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। এই কারণে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই যুবাপুরুষ ও বালক। ফলতঃ তিনি সরলমতি বালকদিগের সহিত থাকিতে ও কথা কহিতে ভাল বাসিতেন। সেই জন্য তিনি আমাদের সখার পাঠকদিগেরও পরম বন্ধু ছিলেন।

তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী বা পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না। সকলকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতেন। এজন্য তিনি কোন কোন ধনী ব্যক্তির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার জিতেন্দ্রিয়তা অসাধারণ ছিল, অর্থকে তিনি অনর্থের কারণ স্বরূপ জানিতেন। একদা উত্তর পশ্চিম দেশস্থ তাঁহার পরিচিত কোন ধনী তাঁহার নিকট আসিয়া কিছু কথাবার্ত্তার পর তাঁহাকে বলিলেন, আপনার এরূপ অবস্থা,—আমি আপনার নামে কোম্পানীতে দশ সহস্র টাকা রাখিয়া দি, তাহার সুদে আপনার খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া তিনি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ওরূপ কথা আর আমার সম্মুখে বলিবে না।" ধনী বিষণ্ণভাবে মাথা হেঁট করিলেন। তিনি লোকের নিকট কখন একটী পয়সা গ্রহণ করেন নাই। যিনি সাংসারিক সুখকে অস্থায়ী এবং

ঈশ্বর দর্শনকে নিত্য অর্থাৎ স্থায়ী সুখ জ্ঞান কবিতেন তাঁহার কি সামান্য অর্থে লোভ জন্মিতে পারে?

পবমহংস বামকৃষ্ণ কোন সদ্গুণশালী লোকেব নাম শুনিলেই তাঁহাকে দর্শন কবিতে যাইতেন। তিনি বলিতেন ঈশ্ববেব বিশেষ কৃপা না থাকিলে মানুষ গুণশালী হয় না।

মথুর বাবুব সহিত তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান, তথায় অন্য সকলেব মধ্যে কেশবচন্দ্র সেনকে ধ্যানস্থ দর্শন কবিয়া বলেন ঐ পাতলা সুন্দর যুবাটীর ফাতনা নড়িতেছে আব সকলে যেন ঢাল তববাব ধবিয়া ধ্যান করিতেছে। মথুব বাবু বলিলেন ঐ যুবাটীব নাম কেশবচন্দ্র সেন, এই তাঁহাব কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথম দর্শন।

ইংরাজী ১৮৭২ সালে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে যখন পবলোকগত কেশবচন্দ্র সেন বেলঘবিয়া নামক গ্রামে বাবু জয় গোপাল সেনেব উদ্যানে প্রচারক বর্গসহ সাধন ভজনায অনুবক্ত ছিলেন, তখন এক দিন পবমহংস এক খানি ছেকড়া গাড়ী কবিয়া কেশবচন্দ্র সেনেব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে যান, সঙ্গে তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাব সহচবগণ সহ স্নান কবিবাব উদ্যোগ করিতেছিলেন। প্রথমে হৃদয ভট্টাচার্য্য আসিয়া কেশব বাবুকে বলিলেন আমাব মামা হরিনাম শুনিতে বড ভাল বাসেন, মহাভাবে তাঁহাব সমাধি হয়। আপনার নিকট তিনি কিছু ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন। তাঁহাব বাহিরেব কোন আড়ম্বর সাজ সজ্জা না থাকায় প্রচারকগণ তাঁহাকে প্রথমে সামান্য জ্ঞান করেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর হরিনাম করিতে তাঁহার সমাধি হইল—সকলে মনে করিল ইহা একরূপ ভেল্কি। কিছু পবে তিনি প্রমত্তভাবে হাসিতে লাগিলেন এবং এরূপ গভীব ধর্ম্মকথা কহিতে লাগিলেন যে তখন সকলেই তাঁহাকে একজন স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোধ কবিলেন। পরমহংসকে দেখিয়া কেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন কবেন। কেবশচন্দ্র তাঁহাকে গুরুব ন্যায় শ্রদ্ধা কবিতেন, কখন তাঁহাব কোন কথাব প্রতিবাদ কবিতেন না। কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বদাই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে যাইতেন। তিনিও কেশবচন্দ্রেব গৃহে আসিয়া অনেক ধর্ম্মালাপ করিতেন। ঈশ্ববকে মা বলিয়া ডাকা ও সেরূপ সাধন করা কেশবচন্দ্র সেন পবমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা কবেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রচাব কবেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুব এক দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে দেখিতে চান। কতিপয় সাধক ও কতকগুলি লোক ভিন্ন পরমহংসকে সাধাবণ লোকে বড চিনিত না। কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাব কথা ও উপদেশ সকল মিবার, ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়া সাধাবণকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত কবান। "পবমহংসেব উক্তি" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক কেশব বাবু আপনি সংগ্রহ কবিয়া মুদ্রিত ও প্রচাবিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি জনসাধাবণেব পবিচিত হইয়াছিলেন। তিনি কখন বিদ্যাভ্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় মহা পণ্ডিত ও জ্ঞানী, এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিধাবী ব্যক্তিগণও, তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

তিনি গুরুগিরি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তাঁহাব নিকট যাহাবা সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে প্রণাম করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমি

সকলের দাসানুদাস।" স্ত্রীলোক মাত্রকেই তিনি আনন্দময়ী মার ছায়া জানিয়া মাতৃবোধে প্রণাম করিতেন। তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না। কত ঘৃণিত পাপীকে তিনি স্নেহভরে আলিঙ্গন দানে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে সকলে গুরু বোধে ভক্তি করিলেও তিনি কাহাকেও শিষ্য জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই মনে করিতেন যে তিনি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করেন। কাহারও একটী সামান্য দোষ দেখিলে তাহা শুধরাইয়া দিতেন। বাস্তবিক তাঁহার ভাব দর্শনে পুন্যের সঞ্চার হইত। পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর হইত। তাঁহার এমনই প্রভাব ছিল যে, তাহার কাছে যাইলে লোকের কঠোর মন নরম হইত, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে বা অন্য প্রচারকদিগের সহস্র উপদেশে যে ফল না পাওয়া যায় তাঁহার কাছে একবার বসিলে তদপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যাইত।

কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি শিখ যিনি যে ধর্ম্মাক্রান্ত হউন সকলকেই তিনি তাহাদের উপযোগী উপদেশ প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন নাই; যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহাকে তিনি তদনুরূপ সাধনা করিতে বলিতেন এবং তাহাদের পরিত্রাণ হইবে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি সত্য বাদীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন, নিজে যাহা বলিতেন তাহা নিশ্চয়ই করিতেন।

১৮০৮ শকে অর্থাৎ গত ১২৯৩ সালে ৩১ শে শ্রাবণ রবিবার তিনি ক্ষতকণ্ঠনালী রোগে বৎসরের অধিক কাল ভুগিয়া ঐহিক লীলা সম্বরণ করেন। প্রথমে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা শ্যামপুকুরে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য চিকিৎসকগণ অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করেন। তৎপর ডাক্তারদিগের মতে কাশীপুরে একটী প্রকাণ্ড উদ্যান বাটী ভাড়া করিয়া তথায় তাঁহার চিকিৎসা করান হয়। এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী সকল রকম চিকিৎসাই হইয়াছিল, কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। তাঁহার পুত্র সম প্রায় ১৫।১৬ জন শিষ্য অবিরত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন এবং অনেকে পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার জন্য অকাতরে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কপর্দ্দকহীন ও গৃহত্যাগী তাঁহার পীড়ার সময় রাজার ন্যায় সেবা ও চিকিৎসা হইল ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেকের বিশ্বাস মানুষ পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হইতে পারে না পরমহংস চরিত পাঠে সে সন্দেহ দূর হইবে সন্দেহ নাই।

সত্য-প্রিয়তা।

ইংলণ্ড দেশের কোন বড় দোকানে এক বিবি ছিটের কাপড় কিনিতে গিয়াছিলেন। দোকানের ভিতরে গিয়া কোনও বিশেষ ছিটের খোঁজ করিলে দোকানের আর এক ধারে তাঁহাকে

যাইতে বলা হইল। সেইখানে একটী বালক কর্ম্মচারী সেই বিবি কি চান তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বালকের বয়স চৌদ্দ বৎসর, মুখখানি সরলতা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, মুখশ্রী দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিশ্বাসের সঞ্চার হয়।

বালক তাড়াতাড়ি নানাবিধ কাপড় দেখাইতে লাগিল। তার মধ্যে এক রকম কাপড় খরিদ-দারের পছন্দ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন "রঙ্গটা কি পাকা? বালক বেশ করিয়া ছিট দেখিয়া পরে উত্তর দিল, না, রঙ্গ পাকা বলিয়া বোধ হয় না। আজ দুদিন হইল এক বিবি ছিটের নিন্দা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, তার কাপড়ের রঙ্গ ফিকে হইয়া গিয়াছে।

বালককে ধন্যবাদ দিয়া বিবি বলিলেন "তবে যদি আমার পছন্দমত ছিট না থাকে তাহা হইলে আমাকে আর এক দোকানে যাইতে হইবে।"

বিবি ও বালক পরস্পরে যেখানে থাকিয়া কথা কহিতেছিল দোকানের মনিব তার কাছেই ছিলেন সুতরাং উভয়ের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিলেন। বিবি দোকান হইতে বাহির হইলেই তিনি বালকের দিকে এগিয়ে এসে কর্কশ-স্বরে বলিলেন "কাপড় ধু'লে রঙ্গ উঠে যাবে একথা বলবার তোমার কি দরকার ছিল?'

বালক আশ্চর্য্যের সহিত চেয়ে দেখে বলিল "বিবি যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমি তাই বলিয়াছিলাম।"

আ! বোকা! কেন বলিলে না যে রঙ্গ ধুলেও উঠে না।

বালক সহজেই বলিয়া ফেলিল "তাহা হইলে যে মিথ্যা বলা হইত।"

তবে "আমি জানি না" একথা ত বলিতে পারিতে।

মহাশয়, তাই বা কেমন করিয়া বলিব, আমি যে জানিতাম।

প্রভু বিদ্রূপস্বরে বলিলেন ও, বুঝেছি, তুমি ধর্ম্মভীরু, সত্য-প্রিয়। যখন এমন, তখন আর এখানে কাজ করা চলে না। তুমি এপ্রকারে আমার খরিদদার তাড়াইবে তা হ'বে না। সপ্তাহ শেষ হইলে তুমি এখান হইতে বিদায় হও।

বালকের হৃদয় একবারে দমিয়া গেল। চাকরি যাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নয়। তাহার মা দুঃখিনী বিধবা। কঠিন পরিশ্রম করিয়া তাহাকে ভাত কাপড়ের যোগাড় করিতে হইত এবং পুত্র প্রতি সপ্তাহে যাহা কিছু উপা-র্জ্জন করিয়া আনিয়া দিত তাহা যৎসামান্য হইলেও তাহাদের পক্ষে তাহা সামান্য নয়। তা ছাড়া বালকের সবে এক মাস হইল চাকরি হইয়াছে। তাহাও আবার তাহার খুড়া মহাশয়ের সুপারিশে জুটিয়াছিল। খুড়োর বেশ দশ টাকা সঙ্গতি ছিল, মনে করিলেই ভাইয়ের ছেলেকে অকাতরে সাহায্য করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি আপনার নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় বন্ধু অপেক্ষা অর্থকে অধিক আদর করি-তেন এবং মনে করিতেন ভ্রাতুষ্পুত্রের চাকরি জুটাইয়া দিয়া তার বিস্তর উপকার করিয়াছেন ও তাহাকে চিরদিনের মত বাধিত করিয়া রাখিয়া-ছেন।

বালকের মনে যখন এইরূপ ভাবনা ও ক্লেশ হইতেছিল তখন কিন্তু কর্ম্মটা ভাল করা হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে তাহার একবারও সন্দেহ হয় নাই। বাস্তবিক তাহার এমনই সৎস্বভাব ছিল যে মিথ্যা কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বাড়ীতে গিয়া আহারের পর মাকে কাজে জবাব দিবার কথা জানাইল।

মা কেবল এই কথা বলিলেন, বাছা। আমার বিশ্বাস তুমি এমন কোন দুষ্কর্ম্ম কর নাই যাতে তোমাকে জবাব দিতে পারে। সবিশেষ শুনিয়া মা দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদের সহিত বলিলেন, বাছা, তুমি ঠিক কাজ করিয়াছ। সত্য বিক্রয় করিয়া চাকরি রাখায় প্রয়োজন নাই।

মা, আপনার মুখে "আমি অন্যায় করি নাই" এই কথা শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু মা, আমি এখন কি করিব, আমার ত এখনি একটী চাকরি চাই, বালক উৎকণ্ঠিত হইয়া মাকে এই কথা বলিল।

মা বলিলেন, আমার বিবেচনায় তোমার খুড়ো মহাশয়ের কাছে যাওয়াই শ্রেয়ঃ হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই তোমার আর একটী চাকরী যোগাড় করিয়া দিবেন।

বিশ মিনিট পরে নগরের খোষপোষাকী লোকেরা যে রাস্তায় বাস করেন সেই পথের একটী সুশোভন অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালক ঘণ্টা ধ্বনি করিল। এক চাকর আসিয়া বালককে সঙ্গে করিয়া তাহার খুড়ার নিকট উপস্থিত করিল।

তাহার খুড়ার আকার প্রকার ভারি গর্ব্বিত লোকের মত ছিল। দেখিলে বুঝা যাইত যে তিনি আপনাকে খুব বড় বলিয়া মনে করেন, কাজে কাজে আর সকলকে হীন চক্ষে দেখেন। মুরব্বিয়ানা চালে বালককে বলিলেন, কেমন হে চাকরি বাকরি কেমন চলচে। "বালক খুড়োকে ভয় করিত সুতরাং থতমত খাইয়া উত্তর করিল "বড় ভাল নয়, খুড়া মহাশয়!"

খুড়ার চক্ষে চসমা ছিল। চসমার মধ্য দিয়া বালকের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়া বালকের কথা পুনরায় উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, বড় ভাল নয়, "কেন, কি হয়েছে?" "যাহা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় দোকানের কর্ত্তা আমাকে সেই কাজ করাইতে চান।" "আমি তোমার কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই কথা শুনিয়া বালক সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল।

কথা শেষ হইলে বালক খুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে তাহাতে অনুগ্রহের চিহ্নমাত্রও নাই। বিরক্তিস্বরে তিনি বলিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার কি মত তুমি কি জানিতে চাও? বালক ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিল আপনি যদি বলেন। তবে শুন তুমি নিতান্ত বোকাম করিয়াছ, ক্রেতাকে ভয় দেখাইয়া তাড়ান তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার বিবেচনায় তোমার মনিব ঠিক কাজই করিয়াছেন। আমি যদি তোমার প্রভু হইতাম তাহা হইলেও আমি ঠিক ঐরূপ করিতাম।

বালক কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল "বিবিকে ঠকান কি ন্যায়মত কাজ হত?" তাহার খুড়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ন্যায়সঙ্গত কাজ হইত কি না সে বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য তোমার সহিত বিচার করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। যাহা হউক এই ত ঘটিল যে তোমার উপস্থিত কর্ম্মটী গেল। আর একটী কর্ম্মের জন্য কি চেষ্টা করিতেছ?

বালক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "খুড়া মহাশয়, আমি মনে করিয়াছিলাম যে আপনি মার অনুরোধে অন্ততঃ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।" তাহার খুড়া খবরের কাগজখানা নিয়ে পড়িতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, তোমাকে সাহায্য করার কোন দরকার নাই, খুব ভাল

চাকরি যোগাড় করিয়া দিলেও ত তুমি এক মাসের মধ্যে কাজ ছাড়িয়া দিবে। যে কাজ রাখিতে চায় না, তার জন্য ক্রমাগত কম্ম খুজে বেড়াতে আমার মাথা ব্যথা পড়ে নাই।

খুড়া বালকের প্রতি এইরূপ বিমুখ হওয়াতে বালক অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "তবে এখন আমি কি করিব?" তুমি কি করিবে এ কথাটা কাজ ছেড়ে দিবার আগে ভাবিলেই ভাল ছিল।

"খুড়া মহাশয়, আমি আশা করি, আমার মার দিকে চাহিয়া আপনি আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিবেন। মাকে খুব বেশী খাটিতে হয়, আবার তার উপর আমাকে তাঁর গলগ্রহ হইতে হইবে।" তা আমি কি করিব, তাঁহার যে খুব কষ্ট হইবে তাহা বেশ বুঝি। কিন্তু সে সমস্তই তোমার দোষ।

বালক দুঃখীর সন্তান ছিল বটে কিন্তু একেবারে মনুষ্যত্ব খোয়ায় নাই। খুড়ার সহিত বাক বিতণ্ডা না করিয়া, তাঁহার অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বালক উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, আমি যাহা ন্যায়ানুগত কার্য্য বিবেচনা করি, তাহা করাতে আমার প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার করা আপনার যদি ভাল বলিয়া বোধ হইল, তাহা হইলে অবশ্য আমাকে কষ্ট সহিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অনাহারে রাখিবেন আমার এরূপ মনে হয় না। বালকের মুখে এপ্রকার সাহস ও তেজের কথা শুনিয়া খুড়ার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "বাড়ী হইতে দূর হ, আর যেন আমাকে তোর মুখ দেখতে না হয়।" বালকও আর একটীও কথা না বলিয়া খুড়ার বাড়ী হইতে বাহির হইল। যে দুঃখের বোঝা লইয়া বালক খুড়ার বাড়ীতে আসিয়াছিল তার চেয়ে অধিক দুঃখভার লইয়া খুড়ার বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল। আপনার সামান্য কুটীরে প্রবেশ করিলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা, কি করিলে?

মা, কিছুই হইল না। আমার সকল আশা ফুরাইয়াছে।

বাছা, নিরাশ হইও না। যখন পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন, পরমেশ্বর তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

মা, তোমার একথা আমি মনে রাখিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু ইহা বড় কঠিন। যখন খুড়া মহাশয় আমার জন্য কিছুই করিলেন না, তখন আমাকে নিজে চেষ্টা করিতেই হইবে।

খুড়ার সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সবিশেষ মাকে জানাইল। তিনি বলিলেন "তিনি যে অতিশয় অন্যায় করিয়াছেন একদিন না একদিন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন। বাছা, তুমি নিরাশ হইও না। আমার খুব বিশ্বাস, যদি আমাদের ধৈর্য্য থাকে তাহা হইলে এই দুঃখ পরে সুখে পরিণত হইবে।"

ক্রমে শনিবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকও দোকানে যাইয়া মাহিয়ানা লইয়া বিদায় হইল। সোমবার হইতে কাজ খুজিতে আরম্ভ করিল।

ঈশ্বর কৃপায় সেখানকার কোনও হোটেলে খবরের কাগজ দেখিবার সুবিধা যুটিয়াছিল। বালক সেইখানে দৈনিক কাগজে কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল এবং নানাস্থানে আবেদন করিল। কিন্তু সকলই নিস্ফল হইল। দেখিতে দেখিতে শুক্রবার আসিয়া পড়িল। চারি দিন ধরিয়া বালক কাজ খুঁজিতেছে কিন্তু কিছুই হইতেছে না, ক্রমে বালক নিরাশ হইতে লাগিল।

এক দিন কাজের চেষ্টায় গিয়া বিফল হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় কাপড়ের দোকানে যে বিবির কাপড় কেনার বিষয়ে বালক

সাহায্য করিয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সৌভাগ্যক্রমে উভয়ে উভয়কেই চিনিতে পারিয়াছিল। বিবি দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিলেন, তোমাকেই না আমি সে দিন কাপড়ের দোকানে দেখিয়াছিলাম?

হাঁ, মা!

তুমি কি সে কাজ ভাল বাস।

আমি কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি।

বিবি একটু আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন কাজ ছাড়িয়া দিয়াছ? কেন ছাড়লে? "আমি আপনাকে সেই যে বলিয়াছিলাম যে রঙ্গ ধুলে উঠে যাবে, সেই জন্য মনিব কাজে জবাব দিয়াছেন।" বিবি ঘৃণা ও রাগের ভরে বলিলেন, "বাস্তবিক এই রকম ক'রে যদি তাহারা কারবার চালায়, আমি আর কখন ওদের কাছে কিছুই কিনিব না। তবে তোমার চাকরি নাই?" হাঁ, মা, আমি কদিন চাকরির চেষ্টায় ফিরিতেছি কিন্তু চাকরি পাওয়া বড়ই কষ্টকর। বিবি বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস, আমার স্বামী একজন সওদাগর, আমি বলিলে তিনি তোমাকে একটী চাকরী অবশ্য দিবেন। আর যদি এমন হয় যে আপাততঃ কোন কর্ম্মখালি না থাকে তাহা হইলেও তোমার একটী উপায় করিয়া দিবেন।"

বালক আহ্লাদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইতেছে, বিবি তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, আমি তোমার জন্য বেশী কিছু করি নাই, আমার জন্য তোমার চাকরি গিয়াছে, তোমাকে একটী কাজ জুটাইয়া দেওয়া আমারই কর্ত্তব্য; তুমি সেথানে কত মাহিনা পাইতে? "মা, আমি সপ্তাহে তিন টাকা পাইতাম।"

বালক বিবির সহিত তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিল। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার স্বামী একটী বিশেষ কাজের জন্য কর্ম্ম স্থান হইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। বালকের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার স্বামী বালককে এক জন হিসাব বিভাগের অতিরিক্ত কেরাণী রূপে নিযুক্ত করিলেন, এবং বর্ষ শেষে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিলেন। স্নেহবচনে আরও বলিলেন আগেকার কর্ম্মস্থানে যেরূপ সততা ও বিশ্বাস দেখাইয়াছ সেইরূপ যদি এখানেও দেখাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আহ্লাদে বালকের সরল ও সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ী পৌঁছিয়াই মাকে এই সুখের কথা বলিল। এই সময় হইতেই তাহাদের সময় ফিরিল। ক্রমাগত উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিয়া সেই দুঃখী বালক এই নূতন কর্ম্মস্থানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইয়া আজিও কাজ করিতেছেন। সুখ সৌভাগ্যের সীমা নাই। আর সেই হতভাগ্য কাপড়ের দোকানদার দেউলিয়া হইয়া যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়াছে, নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় বাস করিতেছে। তাহার অন্যায়োপার্জিত ধন তাহাকে সৌভাগ্যশালী করিতে পারে নাই!

গায়ক পাখি।

থ্রস।

পাখিরা গান গায়। সব পাখি আবার গান গায় না। কাক গান গায় না। কোকিল গায়। কাকও ডাকে, কোকিলও ডাকে, তবে কাকের স্তধুই ডাক, কোকিলের ডাক ডাক নয়, গান। যে পাখির স্বর শুনিতে ভাল লাগে তাহারাই গান করে। আমাদের দেশে অনেক পাখি আছে যেমন শ্যামা, বুলবুল, চোকগেল, বউকথাকও প্রভৃতি, যাদের স্বর বেশ মিষ্টি অথচ এদের এত নাম নাই। আমাদের দেশে কোকিলের বড় নাম। এমন কবি নাই যিনি কোকিল সম্বন্ধে দু-চার কথা না লিখেছেন। সেই সে কালের সংস্কৃত কবি হইতে এই আমাদের আধুনিক বাঙ্গালি কবি পর্য্যন্ত সকলেই কোকিলের ডাকে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে আর কোন পাখির এত গুণ-গাণ শুনিতে পাওয়া যায় না।

আরব্য ও পারস্য কবিরা তাঁহাদের কবিতায় বুলবুলকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, বুলবুলের গুণ দেশ বিদেশে রাষ্ট্র করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বুলবুলের মত কোন পাখিই নাই। এমনি বুলবুলের গান।

বিলাতী কবিদের কাছে শুন "নাইটিংগেল" আর "স্কাইলার্ক"। এই দুইটীই পাখিদের মধ্যে তানসান। এমন কবি নাই যিনি ইহাদের হইয়া দু-কথা না বলিয়াছেন।

এবার আমরা একজাতীয় গায়ক পাখির ছবি দিলাম। ইহাদের ইংরাজিতে থ্রস বলে। ইহাদের গানও বেশ সুমিষ্ট। কবিদের পুস্তকের মধ্যে ইহারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নাইটিংগেল ও বুলবুল জাতীয়। দেখিতে অনেকটা ছাতারিয়া পাখির মত। এক জন ইংরাজি লেখক এই থ্রস সম্বন্ধে মনের আবেগে কটমট ইংরাজিতে এইরূপ লিখিযাছেন:—"সন্ধ্যার সময়ে যখন দূরস্থ জল প্রবাহের অস্ফুট কুল কুল শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না, যখন সান্ধ্য সমীরণ বিকশিত কুসুমের সৌগন্ধি অপহরণ করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া দেয়, তখন কোন বৃক্ষশাখা বা গিরিপার্শ্ব হইতে থ্রসের সঙ্গীতরব নির্গত হইয়া বন ও গিরিগাত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। অন্যান্য পাখির আরও কত চমৎকার গান থাকিতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহাই যথেষ্ট। ইহার গীতধ্বনি আত্মার গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়, প্রাণকে কোমল করিয়া দ্রব করিয়া দেয়, মনে পবিত্র শান্তি বিস্তার করে, পৃথিবীর শান্তিকে স্বর্গের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সহিত মিশাইয়া দেয়। ইহার মোহিনী শক্তি মানব মনের দুঃখ-সমুদ্রের আন্দোলিত বারিকে প্রশান্ত করিয়া দেয়।" ইত্যাদি অনেক। ইহাদের গানটা কিরূপ শুন – কুই, কুই, কুই, কুঈন, কুইপ্—টিউরু টিউরু, চিপ্উই—টু-টী, টু-টী, চিউ চু—চিব্‌রি, চিব্‌রি, চুঈ—কুই, কুই, কুই।

ইহারা প্রায়ই নদী বা পুকুরের ধারে বনের মধ্যে থাকে। ফড়িং প্রভৃতি ছোট ছোট পোকা আর সামুক গুগ্‌লি ইহাদের খাদ্য। সামুক মুখে লইয়া পাথর, ইঁট বা গাছের গুঁড়িতে আছ্‌ড়াইয়া ভাঙ্গিয়া খায়। ছোট ছোট ফল ও শস্যাদিও ভক্ষণ করে। ইহাদের বাসার ভিতরের দিকটা কচি পাতা, ঘাস, খড় প্রভৃতি কোমল দ্রব্যের। বাহিরের দিকটা গাছের শিকড়, কাঠের টুকরা, দড়ি,

সুতা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের গায়ের রং ধূসর অথচ একটু সবুজের আভা যুক্ত, ডানার উপর হল্‌দে রঙ্গের ফুট ফুট আছে। পেটের দিকটা সাদা তাতে কাল ফুট ফুট। পা একটু লাল্‌চে রঙ্গের।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

একশত বৎসরেরও অধিক হইল বাঙ্গালায় এক ভয়ানক মন্বন্তর উপস্থিত হয়। তখন ভারত ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই; আজ ইংরাজ ভারতের একচ্ছত্র রাজা, কিন্তু তখন ইংরাজ বাঙ্গালার দেওয়ান মাত্র। ইংরাজ রাজ্যের প্রথম সূত্রপাতের সময় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্গালায় যে মন্বন্তর উপস্থিত হয়, আজিও বাঙ্গালী তাহার ফলভোগ করিতেছে। এ প্রকার মন্বন্তর কেহ কখনও দেখে নাই—শুনে নাই। ইতিহাসে লেখে বাঙ্গালা দেশ যখন মোগল সম্রাটের অধিকার ভুক্ত হয়, তখনও এই প্রকার একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজার রাজধানী গৌর নগর ইহাতেই শ্রীভ্রষ্ট এবং ধ্বংস হইয়া যায়।

সিরাজুদ্দৌলার পর মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে বসিয়াছেন। ইংরাজ বাঙ্গালার দেওয়ান। রাজস্ব ইংরাজ আদায় করেন; মীরজাফরের উপর রাজ্য শাসনের অর্থাৎ বাঙ্গালীর প্রাণ ও ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার। মীরজাফর মহা পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু ও কাপুরুষ; মীরজাফর আত্মরক্ষায় অসমর্থ, প্রজা রক্ষা করিবে কিরূপে? সুতরাং বাঙ্গালার লোকের তখন কি প্রকার অবস্থা তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইংরাজ রাজ্য শাসন করেন না, কেবল রাজস্ব আদায় করেন। মীরজাফর রাজ্যশাসনে অক্ষম; সুতরাং বাঙ্গালা ক্রমে অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠিল। দস্যু ভয় এই সময় বাঙ্গালায় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ইহারই দুই তিন বৎসর পরে ঘটে। কিন্তু সে কথা আর আজ নহে; সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভাল রকম ধান্য জন্মিল না, সুতরাং ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাস চা'ল কিছু দুর্ম্মূল্য হইল। দেশের লোকের কিছু কষ্ট হইল; কিন্তু ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হওয়াতে লোকের আশা হইল, আয়েন্দা সনে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, কর্ত্তিকেও বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না। ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ধান্যের গাছ জন্মিয়াছিল, ফলিলে তাহাতে লোকের সকল কষ্ট দূর হইত, লোকের অবস্থা স্বচ্ছল হইত। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ক্ষেত্রের ধান্য শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। শস্য যখন খুব প্রচুর পরিমাণে ফলে, তখন রাজপুরুষেরা সিপাহীদের জন্য সুলভ মূল্যে শস্য কিনিয়া রাখেন; আর যেবার ফসল ভাল না হয়, সেবারও যত মূল্যেই কেন হউক না রাজপুরুষেরা সিপাহীদের জন্য কতক কিনিয়া রাখিবেনই। এবারও তাহাই হইল; ক্ষেত্রের ধান্য শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছিল, যাহা কিছু ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পায় না। চা'ল ক্রমে অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইল, ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল; দেশে এক মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। চৈত্রের ফসল দেখিয়া লোকের একটু আশা হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যে প্রকার অভাব, তাহার পক্ষে ইহা অতি সামান্য; চৈত্রে যাহা কিছু জন্মিল, তাহাতে লোকের পেট ভরিল না। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর দেখিয়া কৃষকের প্রাণ শুকাইয়া গেল, গৃহস্থ মহা ভীত হইল, রাজা রাজস্ব আদায় হইবে না ভাবিয়া

বিষণ্ণ হইলেন। বাঙ্গালীর প্রাণান্তেও মুখ ফুটে না, কিন্তু সকল জিনিষেরই সীমা আছে, বাঙ্গালীর এই অসাধারণ ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। লোকে আধপেটা খাইল, তার পর এক সন্ধ্যা খাইল, তার পর তাহাও পাইল না। তখন দেশ মধ্যে এক মহা হাহাকার উঠিল। মাঠে ধান্য শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছে, গোলায় ধান্য নাই, গৃহস্থের গৃহে চা'ল নাই। যাহারা কোন দিন ভিক্ষা করে নাই, পেটের দায়ে তাহারাও ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তার পর তাহাও পাইল না, ভিক্ষা কে দিবে—কোথা হইতে দিবে? চা'ল প্রথমে খুব দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, তার পর একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

কৃষকেরা প্রথমে বীজ ধান খাইল, তার পর গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, তার পর ঘর বাড়ী, জোত জমা, যা কিছু ছিল, পেটের দায়ে সব বেচিল। কিন্তু তাহাতেও পেট ভরে না—পেটভরা দূরে থাক, সকলের মুখে একমুঠা করিয়াও কুলায় না। ইতিহাসে লেখে পিতামাতা হৃদয় পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণসম ছেলে মেয়েদিগকে তখন বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর তাহাই বা কে কিনে? বাজারে খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। গৃহস্থের গৃহে যত দিন টাকা কড়ি ছিল, ততদিন কায় ক্লেশে দিন কাটাইল, তার পর ভিক্ষা আরম্ভ করিল, তার পর আর তাহাও পায় না। ধনীর গৃহ অর্থে পরিপূর্ণ, কিন্তু দেশে চা'ল নাই—অর্থে কি করিবে? সোণা রূপা, টাকা কড়ির তখন আর কোন মূল্য নাই—টাকা তখন মাটির অপেক্ষাও হীন। তখন একমুঠা টাকা অপেক্ষা একমুঠা চা'লের মূল্য সহস্র গুণে অধিক। পেটের দায়ে লোকে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। ইহারা টাকা কড়ি,ধন সম্পত্তি হরণ করিত না—সোণা রূপা দিয়া তখন কি করিবে? যাহার ঘরে এক মুঠা চা'ল আছে সন্ধান পায়—কাড়িয়া খায়, হয়ত অপহৃত একমুঠা চা'ল লইয়া নিজেরাই কাটাকাটী করিয়া মরে। দেশের তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। কোটী কোটী লোক অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে, দেশে চা'ল নাই! ধনীর গৃহ ধনে পূর্ণ, কিন্তু তাহার শিশুসন্তান অন্নাভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; সে আর্ত্তনাদে মাতার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, পিতার বুকে শেল বিঁধিতেছে; কিন্তু উপায় নাই—দেশে চা'ল নাই! একবার সেই ধনীর গৃহের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। শত দাস দাসী যাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিল, আজ তাহারা কেহ নাই। যে গৃহ আমোদ প্রমোদ ও উচ্চ হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত, আজ তাহা নীরব; কেবল মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদের অস্ফুটধ্বনি উঠিতেছে। বাজারে যাও দেখিবে হাট বাজার লোক শূন্য; গ্রামে যাও দেখিবে গ্রাম মনুষ্য শূন্য। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে লোক নাই। শত শত গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহাতে মানুষ নাই। মধ্যে মধ্যে কেবল শিশু ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। গ্রামের লোকেরা গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, দলে দলে নগরের দিকে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়াছে,—আশা নগরে ভিক্ষা খাইতে পাইবে! কতক নগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে, কতক তাহাও পারিতেছে না। অনাহারে ও রোগে পথেই মরিতেছে। একবার ভাবিয়া দেখ কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। পরিবারের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া লোকে আত্মরক্ষার জন্য উন্মত্তের মত কেবল চারিদিকে ছুটিতেছে। পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে,মাতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, স্বামী স্ত্রীকে অনাথা করিয়া যাইতেছে; কেহ কাহারও দিকে চাহিতেছে না! দেশময়

কেবল হাহাকার। দলে দলে রুগ্ন শীর্ণ ক্ষুধায় উন্মত্ত লোক নগরের দিকে ছুটিতেছে; দলে দলে গৃহ ছাড়িয়া পলাইতেছে, যাহারা পলাইতেছে তাহারা কতক পথেই মরিতেছে, কতক বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিতেছে। যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা না খাইতে পাইয়া রোগে ভুগিয়া, মরিতেছে।

লোকে প্রথমে খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করিল, পরে ঘাস খাইতে লাগিল, আগাছা খাইতে আরম্ভ করিল। ইতর লোকে ইন্দুর, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করিল। ইতিহাসে লেখে শেষে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা আর কিছু না পাইয়া মৃত মানুষের মাংস খাইতে আরম্ভ করিল।

বিপদ প্রায় একা আসে না। রোগ সময় বুঝিয়া উপস্থিত হইল; জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয় এবং বসন্ত রোগে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল, বিশেষ বসন্তের প্রকোপ কিছু অধিক হইয়াছিল। কে কাহার চিকিৎসা করে, কে কাহাকে দেখে, কে রোগীর মুখে একবিন্দু জল দেয়। কেহ কাহাকে দেখে না, কেহ কাহাকে স্পর্শ করে না, মরিলে কেহ তাহার সৎকার করে না, যে গৃহে রোগ প্রবেশ করে, গৃহবাসীরা রোগীকে ফেলিয়া সে গৃহ হইতে পলায়ন করে। মরিলে গৃহ হইতে ফেলে না—মরে আর গৃহ মধ্যে আপনি আপনি পচে!

রাজপথের দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর। দলে দলে শীর্ণ, শুষ্ক দেহ, ক্ষুধার্ত্ত লোকেরা উন্মত্তের মত ছুটিতেছে; কেহ রোগ যন্ত্রণায় পথে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; কেহ আসন্ন মৃত্যুকালে ক্ষীণ কণ্ঠে একবিন্দু জলের জন্য কাতরাইতেছে—কে তাহার কথা শুনে? কেহ মরিতেছে, কত সহস্র সহস্র মৃত দেহ রাজপথে পড়িয়া রহিয়াছে। শকুনী গৃধিনী শিয়াল ও কুকুরেরা দিবাভাগে সেই প্রকাশ্য রাজপথে মহানন্দে সেই শবমাংস ভক্ষণ করিতেছে। কে কাহার সংবাদ লয়? ক্ষুধার্ত্তের হাহাকার, রোগীর আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষুর কাতরতা এবং এই শকুনী গৃধিনী ও শিয়াল কুকুরের বিকট কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।

চিরদিন কিছুই থাকে না, কালে সকলই যায়। যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গলা উৎসন্ন হইয়াছিল, তাহাও চলিয়া গেল। ১১৭৭ সালে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভগবান প্রসন্ন হইলেন। এবৎসর বেশ বৃষ্টি হইল, পৃথিবী আবার শস্য-পূর্ণ হইল; কিন্তু খাইবার লোক নাই। ৭৬ সালে দেশ শস্য শূন্য হইয়াছিল, লোকে না খাইতে পাইয়া মরিল, ৭৭ সালে দেশ শস্যে পূর্ণ হইল, খাইবার লোক জুটিল না। ইতিহাসে লেখে এই মন্বন্তরে বাঙ্গলার দশকোটী অর্থাৎ প্রায় ছয় আনা রকম লোক প্রাণ হারায়!

খুব শস্য হইল বটে কিন্তু দেশ জনশূন্য। গ্রামে গ্রামে বাড়ী পড়িয়াছে তাহাতে বাস করিবার লোক নাই; শত শত উর্ব্বরা ভূমি পড়িয়া রহিয়াছে, কর্ষণ করিবার লোক নাই। ক্রমে মাঠ গ্রাম জনপদ সমস্ত জঙ্গলময় হইয়া উঠিল। বৎসরের পর বৎসর গেল ক্রমে জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যেখানে সমৃদ্ধ নগর ছিল, সেস্থান সিংহ ব্যাঘ্রের আবাসস্থান হইল। দেশের তিন ভাগের এক ভাগেরও অধিক ঘোরতর জঙ্গলে পরিণত হইল। কত গ্রাম কত নগর সেই মন্বন্তরে উৎসন্ন গিয়াছে, আজও তাহা ঘোরতর জঙ্গলে পরিপূর্ণ—কেবল সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া রহিয়াছে!

সমালোচনা।

সখায় যে সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকাদি সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, তাহার অনেকই আমরা সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারি না। ইহাতে গ্রন্থকারগণ হয়ত আমাদের উপর অনেক সময় অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগের নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে আমরা অসমর্থ। যে সকল পুস্তক সখার পাঠক পাঠিকাদিগের উপযোগী এবং যে সকল পুস্তক পাঠে সখার পাঠক পাঠিকাদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা, আমরা কেবল সেই সকল পুস্তক সমালোচনা করিতে পারি, অন্যান্য পুস্তক সমালোচনা করা সখার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরে। সুতরাং গ্রন্থকারগণ আমাদিগের ত্রুটি লইবেন না। যে সকল গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকাদি আমাদিগকে উপহার দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা নিতান্ত বাধিত আছি, এবং তাঁহাদের উপহার অতি আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। যে কারণে সকল প্রকার পুস্তক আমরা সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারি না, তাহা উল্লেখ করা হইল, সুতরাং আশা করি গ্রন্থকারগণ আমাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।

কলিকাতা আশাদলের (Band of Hope) জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক প্রণীত সুরাপান বা বিষপান নামক পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। সুরাপানে আমাদের দেশের কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সুরা বিষে যে আমাদের দেশ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, কত সুখের সংসার শ্মশান হইয়া গিয়াছে কত গৃহ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কত শত রমণী বিধবা হইয়াছে, কত বালক বালিকা অনাথ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই সুরা বিষে কত সংসারের সুখ শান্তি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে, পরিবারের মধ্যে স্নেহ ভক্তি ভালবাসা চলিয়া গিয়াছে,—আছে কেবল অশান্তি, অশ্রুজল ও হাহাকার। খোলাভাটীর কল্যাণে এখন আমরা প্রতি গ্রামে, প্রতিগৃহে সুরাপানের বিষময় ফল দেখিতে পাইতেছি। পৃথিবীতে যত প্রকার দুষ্কার্য্য সাধিত হয়, তাহার অনেকের মূল সুরাপান। ইহাতে শরীরের স্বাস্থ্য যায়, বল যায়, বুদ্ধি যায়, শেষে জীবন পর্য্যন্ত যায়। দেশের জেল, পাগলাগারদ, দরিদ্রালয় প্রভৃতিতে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে কত লোক সুরাপানে জেলে গিয়াছে, কত লোক সুরা বিষে পাগল হইয়া গিয়াছে, কত লোক সুরা পানের জন্য পথের ভিখারী হইয়াছে। মদ্যপান করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, মানুষ পশুর সমান হয়। জ্ঞান বাবু এই সুরা বিষপানের বিষময় ফল এবং ইহা দ্বারা আমাদের দেশের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে, দেশের লোকের দিন দিন কি দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত সংগ্রহ করিয়াছেন। সুরাপানে যত প্রকার ক্ষতি হইতেছে, কি উপায়ে সুরাপান দেশে কমিতে পারে এবং সুরা সম্বন্ধীয় অনেক কথা এ পুস্তকে আছে। এই পুস্তক খানি লিখিতে জ্ঞান বাবুকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, সেজন্য তাঁহাকে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। পুস্তক খানি প্রকাশ করিয়া জ্ঞান বাবু দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন, এ পুস্তক যতই পঠিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। সখার পাঠক পাঠিকাগণ সুরাকে চিরদিন বিষ বলিয়া জানিবে; এবং সুবিধা হইলে এই পুস্তকখানি এক একবার পড়িয়া দেখিবে।

সখা
ষষ্ঠ ভাগ। দ্বাদশ সংখ্যা।

ডিসেম্বর, ১৮৮৮।

নানাকথা।

এখনকার জর্ম্মন সম্রাটের পিতামহ সম্রাট উইলিয়াম, যাঁহার কয়েক মাস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে, একবার কয়েক জন বন্ধুর সহিত শীকার করিতে গিয়াছিলেন। শীকার করা শেষ হইলে সম্রাটের হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সাধ হয়। তাঁহার সহিত সাক্সনির রাজা ও ম্যাকলেনবর্গের ডিউকও হাঁটিয়া আসিতে লাগিলেন। শীকারের পরিশ্রমের পর অনেক দূর হাঁটিয়া আসায় তাঁহাদের বড় ক্লান্তি বোধ হইল। রাস্তায় দেখিতে পাইলেন একজন লোক একখানা ভাঙ্গা কাঠ-বোঝাইএর গাড়ি লইয়া আসিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। সেও পয়সার লোভে স্বীকৃত হইল। খানিক দূর গিয়া তাঁহারা কে এই জানিবার জন্য গাড়োয়ানের বড় কৌতূহল জন্মে। সে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ হে তুমি কে" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন 'আমি ম্যাকলেনবর্গের ডিউক'—"হ্যাঁ তাইত"; "তুমি কে মশাই" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন 'আমি সাক্সনির রাজা'—"বেশ বেশ"; "আর তুমি কোথাকার রাজা" তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন 'আমি জর্ম্মণ দেশের সম্রাট'। গাড়োয়ানের ওসব কিছুই বিশ্বাস হইল না, সে মনে করিল এই তিনজন লোক তাহার সহিত বড় মজাই করিতেছে। সে বলিল "আচ্ছা আমি কে জান, আমি পারস্য দেশের রাজা"। তারপর রাজার বাড়ী পৌঁছিয়া যখন দেখিল অনেক লোক জন সাজ সজ্জা করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাদের নমস্কার করিতেছে, তখন তাহার চৈতন্য হইল, অমনি তাঁহাদের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

প্রুসিয়ার রাজা ফ্রেডরিক দি গ্রেটের রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে একটী কল কারখানার ঘর ছিল। বাড়ীটি দেখিতে বড় কদর্য্য; কেবল ধোঁয়া ধূলায় সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত, রাজার চোখের সাম্‌নে অমন কুৎসিৎ জিনিষ কেন থাকিবে। রাজার সেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইল। তিনি সেই কারখানার কর্ত্তাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে যত টাকা চায় তত টাকা দিয়া তিনি ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। কিন্তু গৃহস্বামী এই বাড়ী কিছুতেই বিক্রয় করিতে রাজি হইল না। তখন রাজা বলপূর্ব্বক ঐ বাড়ী ভাঙ্গাইয়া দিলেন। সে লোকটা তখন বলিল "আচ্ছা এখন বাড়ী ভাঙ্গ, দেশে আইন আছে, আমি দেখে নেব"। তৎপরে সে বিচারালয়ে রাজার নামে নালিস করিল। জজেরা বিচার করিয়া বলিলেন যে "রাজা বড় অন্যায় কায করিয়াছেন, তাঁহাকে পুনরায় ঐ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে এবং তাহার

সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে আমরা আদেশ করিতেছি"। কার হুকুমের জোর বেশী—রাজার, না রাজা যে আইন করিয়াছেন তাহার? আইনেরই বেশী। রাজা বাধ্য হইয়া পুনরায় সেই বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক টাকা দিলেন। যদিও রাজা মনে মনে বিরক্ত হইলেন তবুও বলিতে লাগিলেন "দেশে যে এমন সুন্দর আইন আছে এবং সেই আইন প্রচলিত করিতে যে এমন সৎ বিচারক আছেন তজ্জন্য আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম।"

সেই ব্যক্তির বংশধরেরা অদ্যাবধি সেই কারখানার অধিকারী। আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল এই কারখানার কোন মালিকের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় সে এই বাড়ী বিক্রয় করিবার ইচ্ছায় জর্ম্মন সম্রাট উইলিয়ামের নিকট পত্র লিখে। ঐ পত্রে রাজা ফ্রেডরিকের সহিত ঐ বাড়ী লইয়া যে বিবাদ হয় তাহারও উল্লেখ করে। উইলিয়াম তাহার উত্তরে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন :—

প্রিয় প্রতিবাসি—আমি তোমায় ঐ বাড়ী বিক্রয় করিতে দিব না। যত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের কেহ জীবিত থাকিবে তত দিন উহা তোমাদেরই থাকিবে। উহা প্রুসিয়ার ইতিহাসের অংশ স্বরূপ। তোমরা সম্প্রতি বড় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছ শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। এই পত্রের সহিত তোমাকে ৬০০০ ছয় সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিলাম, ভরসা করি তোমাদের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে। আমাকে সর্ব্বদা তোমাদের প্রিয় প্রতিবাসী মনে করিও—

ফ্রেডরিক উইলিয়াম।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক রাবিলে রসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। একবার তিনি ফ্রান্সের রাজধানী পারিস হইতে কোন দূরস্থ নগরে গমন করেন। সেই স্থানে তাঁহার যাহা কিছু সম্বল ছিল সব ফুরাইয়া যায়। পারিসে ফিরিয়া আসিবার ব্যয়ের কিছুমাত্র সংস্থান নাই, অথচ শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন এক বড় জুয়াচুরি ফন্দি বাহির করিলেন। তিন চারিটা ছোট ছোট কাগজের বাক্সে সুরকি আর ধুলা পূরিয়া সেই বাক্সগুলির উপর "রাজার প্রাণবধের জন্য বিষ" এই কথা বড় বড় করিয়া লিখিয়া তাহার নীচে 'রাবিলে' নাম স্বাক্ষর করিয়া যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর নানা স্থানে সকলে যাহাতে দেখিতে পায় এরূপ ভাবে ফেলিয়া রাখিলেন। পরদিন গৃহস্বামী 'রাবিলে' স্বাক্ষরিত "রাজার প্রাণবধের জন্য বিষ" দেখিতে পাইয়া পুলিসে খবর দিল। পুলিস আসিয়া রাবিলেকে রাজার প্রাণ নাশের চেষ্টার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ সরকারী খরচে পারিসে পাঠাইয়া দিল। রাবিলে বিনা ব্যয়ে পারিসে হাজির। বিচারে সেই বাক্সগুলিতে বিষের লেশ মাত্র না পাওয়ায় রাবিলের কোন অপরাধ প্রমাণ হইল না। রাবিলে অক্লেশে মুক্তি পাইলেন।

সকল দেশেই লোকে শোকের চিহ্ন ধারণ করে। আমরা শোক চিহ্ন স্বরূপ সাদা কাপড়, থানের ধুতি প্রভৃতি ব্যবহার করি। পুরাকালে গ্রীক ও রোমীয়েরা শোক সময়ে আমাদের ন্যায় শ্বেত বস্ত্র ব্যবহার করিত। এখন ইউরোপীয় সমস্ত জাতিরই শোক চিহ্ন কাল বর্ণের। ইজিপ্টে হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। শোক সময়ে তুর্কিরা বেগুনি রঙ্গের বস্ত্র পরিধান করে। চীনেরা সাদা কাপড় পরে।

লর্ড ল্যান্সডাউন।

আমাদের একজন নূতন বড়লাট আসিয়াছেন। ইনি লর্ড ল্যান্সডাউন। ইহাঁর বয়স অধিক নয়, ৪৪ বৎসর মাত্র। অন্যান্য লাটেরা প্রায় সকলেই ইহাঁ অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ইনি অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিলাতের রাজা এডওয়ার্ড দি

নর্মানদিগের সময় হইতেই অর্থাৎ সাত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের খুব প্রাতপত্তি সেই সময় হইতেই ইহার পূর্ব্ব পুরুষগণ রাজনৈতিক ও যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রিটিস রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন। প্রথম মার্কুইস লর্ড সেলবোর্ণ তৃতীয় জর্জ্জের মন্ত্রী ছিলেন। বর্ত্তমান লর্ড ল্যান্স-ডাউনের অর্থাৎ আমাদের বড়লাটের পিতামহ তৃতীয় মার্কুইস অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া খুব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইয়াছেন। লর্ড সভায় বিশ বৎসর ধরিয়া দলপতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ জর্জ্জ, চতুর্থ উইলিয়ম এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র আমাদের বড়লাটের পিতা রুগ্ন ও দুর্ব্বল অবস্থায় তিন বৎসর মাত্র পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধি ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন।

আমাদের বড়লাট ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি অক্সফোর্ডের ইটন ও ব্যালিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং কিয়ৎ-কালের জন্য উইল্টস্ ইউমনিরি অশ্বারোহী সৈন্য দলের কাপ্তান ছিলেন।

কলেজে অধ্যয়ন কালে লেখা পড়া অপেক্ষা মৃগয়া ক্রিকেট খেলা ও নৌকা বাহনে খুব আসক্ত ছিলেন। ১৮৬৬ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী হয়েন।

১৮৬৮ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। গ্লাডষ্টোন তখন মন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্রী সভায় কোন ছোট পদে ইহাঁকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এক বৎসর পরেই ডিউক অব এবার-কর্ণের কনিষ্ঠা দুহিতাকে বিবাহ করেন। ১৮৭২ সালে লর্ড ল্যান্সডাউন যুদ্ধ বিভাগের ছোট সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েন। ১৮৮০ সালে গ্লাডষ্টোন মন্ত্রী হইলে ইনি ভারতবর্ষের আণ্ডার সেক্রেটারি হয়েন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার দুই মাস পরে মন্ত্রিসমাজের সহিত তাঁহার মত বিরোধ হওয়ায় সে পদ পরিত্যাগ করেন। ইহার পর তিন বৎসর কোন কর্ম্ম করেন নাই। ১৮৮৩ সালে লর্ড লান্সডাউন ক্যানাডার গবর্ণর হইয়া তথায় গমন করেন। ক্যানাডার গবর্ণররূপে ইহাঁর কীর্ত্তি-কলাপ বড়ই প্রশংসনীয় হইয়া উঠে। তিনি নানাগুণে প্রজাগণের প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এক রেলওয়ে নির্ম্মাণ করেন। ক্যানাডা-বাসীদিগের শিল্প কার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। লর্ড ল্যান্স-ডাউন কার্য্যক্ষম, মিষ্টভাষী, বাকপটু ও রহস্যশীল বলিয়া ক্যানাডায় যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি অতিথি সৎকারে বড় নিপুণ, এ বিষয়ে ইহাঁর সহধর্ম্মিণী ইহাঁর প্রধান সহায়।

লর্ড ল্যান্সডাউন আইরিশম্যান। আয়র্লণ্ডে ইহাঁর বিস্তৃত জমিদারী আছে। বিলাতে ইহাঁর বড় বড় বাড়ী আছে।

ইহাঁর চারি সন্তান;—দুই কন্যা ও দুই পুত্র। ইহাঁর নাম—হেন্‌রি চার্লস্ কীথ পেটি-ফিট্‌জ্‌মরিস্ - ইহাঁর উপাধি—মার্কুইস অব ল্যাণ্ডস্-ডাউন্ জি, সি, এম্, জি; আর্ল্ ওয়াইকোম্ব; ভাইকাউণ্ট ক্যাল্‌ন ও ক্যাল্‌নষ্টোন; আর্ল অব-কেরি এবং আর্ল অব সেলবর্ণ; ভাইকাউণ্ট ক্লান্‌মরিস্ ও ফিট্‌জ্‌মরিস্; ব্যারন্ অব কেরি, লিক্‌স্‌ন ও ডান্কার্টন্।

ভাই বোন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(১৪৭ পৃষ্ঠার পর ।)

পূর্ব্ব কথিত ঘটনার ৭ বৎসর পর বর্দ্ধমান জেলার কোন গ্রামের এক পুকুরের ঘাটে, বিকাল বেলা দুই জন লোক বসিয়া কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন। গ্রীষ্ম কাল, বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একটু একটু দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। আমরা যে দুই জনের কথা বলিলাম তাহাদের মধ্যে এক জন পুরুষ, অন্যটী স্ত্রীলোক। উভয়েরই বয়স বিশ বৎসরের উপর হইবে। চেহারা দেখিয়া বোধ হয় তাহারা বড়ই সুখে আছে। দুজন ভাই ভগিনী। ভ্রাতা মনের সুখে দিদির নিকট কত কথা বলিতেছেন। বলিতে বলিতে ছেলেবেলার কথা উঠিল। তখন উভয়েরই মুখের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইল। যেন তাহাদের সে সুখের মধ্যে দুঃখের একখানা মেঘ উঠিল। ভগিনীর চক্ষু দিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তখন ভ্রাতা বলিলেন—

"দিদি, একবার যদি বাবা কিম্বা মার কোন নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম, তবেই দুঃখ দূর হইত।"

দিদি। "না ভাই সে আশা আর নাই। পরমেশ্বর সুখের মধ্যে মনে একটা দুঃখ রাখিলেন, এ দুঃখ আর দূর হইবে না।

ভাই। "কেন দিদি, যিনি আমাদের এত দুঃখ দূর করিয়াছেন তিনিই এ দুঃখ দূর করিতে পারেন। তাঁহার উপর বিশ্বাস কর—তাঁহাকে ডাক, দেখ তাঁহার দয়া হয় কি না?"

এইরূপ কথাবর্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ পথিক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাঁহারা আগন্তুককে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইলেন এবং মহিলাটী সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। ভদ্রলোকটী আগন্তুককে সসম্মানে বসিতে বলিলেন। বৃদ্ধ বসিয়া বলিলেন—

"মহাশয় ক্ষমা করিবেন—আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, সন্ধ্যা হইয়াছে, এখানে অনেকের নিকট আশ্রয় চাহিলাম, পাইলাম না। ভরসা করি আপনি বিমুখ হইবেন না।"

যুবক। আজ্ঞে এ আর কত বড় কথা। মহাশয় সেজন্য চিন্তিত হইবেন না। এখানে বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল শ্রান্তি দূর করুন। পরে আপনার থাকিবার বন্দোবস্ত করা যাইবে।

বৃদ্ধ। এখানে বসাটা কি ভাল দেখায়? চলুন বাহির বাড়ীতে যাওয়া যাক।

যুবক ও বৃদ্ধ বহির্ব্বাটীতে চলিলেন। সেখানে গিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন বাড়ীটী অতি পরিষ্কার ও সুসজ্জিত। ভৃত্যেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহারা বাবুকে দেখিয়া শশব্যস্তে আসিয়া আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিল। বাবু বলিলেন "দক্ষিণ দিকের একটা কামরায় পরিষ্কার করিয়া সেখানে একটা বিছানা করে দাও, আর বাড়ীর ভিতরে বল যে, এক জন ভদ্রলোক এসেছেন, একটু জলখাবার যোগাড় করে দিক্।

সে চাকর আদেশ পাইয়া চলিয়া গেল। অন্য এক জনকে হাত মুখ ধোবার জল দিতে বলিয়া বাবু বাড়ীর ভিতর গেলেন। গিয়া দিদিকে বলিলেন "দিদি! অতিথি এসেছে দেখেছ? আমার মনটা যেন কেমন করিতেছে—কোথা যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। তুমি একবার উকী দিয়ে ভাল করে দেখ দেখি, তোমার কিছু মনে হয় কি না।"

যুবক বাহিরে আসিলেন, বাহিরে শীতল বায়ুতে একটু বেড়াইলেন কিন্তু তাঁহার মন শান্ত হইল না, কি যেন মনে ঢেউ খেলিতেছে, ছেলেবেলার কত কথা মনে উঠিতেছে—সেই প্রবল বাতাস, জল, অন্ধকার রাত্রি, মা বাপ, শিশু ভাই সকলই একে একে মনে হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে কত বাসনা মনে জাগিল, আবার নিবিয়া গেল। "এই সুখের দিনে যদি স্বর্গীয়া জননীর বুকে মাথা রাখিতে পারিতাম" "একবার যদি পিতার চরণ দর্শন করিতে পারিতাম" এইরূপ কত ভাবিলেন, মন আরও অস্থির হইল। অবশেষে মনে হইল অতিথি একাকী বসিয়া আছেন, অমনি সেখানে গেলেন।

অতিথির মনে কি হইয়াছিল তাহা আমরা বলিব না। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "বড় একটা কৌতূহল হইতেছে। মহাশয় কি চিরকালই এখানে বাস করিতেছেন? না, এখানে নূতন বাস করিতেছেন?"

যুবক। কেন মহাশয়? আপনার এরূপ সন্দেহ হইতেছে কেন?

বৃদ্ধ। এখানে কোথাও আশ্রয় পাইলাম না, এখানকার লোকে কাহাকেও রাত্রিতে থাকিতে দেয়, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনি কেন এত আদর করিলেন? আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ভিন্ন আর কোথাও অতিথির প্রতি এত আদর দেখি নাই।"

যুবক। মহাশয়! আমরাও একদিন সেখানকার লোক ছিলাম, অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখানে এসেছি।

বৃদ্ধের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য যুবক সমস্ত কথা বলিলেন। কেমনে এখানে এসেছেন তাহাও বলিলেন। শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষুতে জল আসিল; তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, দুঃখে কি সুখে তাহা যুবক বুঝিলেন না। আমরাও জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে বাধ্য যে ইনিই আমাদের—বসু বাবু। এবং যুবক তাঁহার পুত্র। পূর্ব্ব কথিতা রমনী তাঁহার কন্যা।

কন্যা দেখিয়া পিতাকে চিনিয়াছেন। ভাই বাবাকে চিনিতে পারেন কিনা তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে রহিয়াছেন।

বৃদ্ধ যখন পুত্রের সকল কথা শুনিলেন তখন তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। যুবক তখন আর থাকিতে পারিলেন না। "বাবা" বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাকরেরা দেখিয়া সকলে অবাক হইল। বাড়ীর ভিতরে একবার গেল। তখন দিদিঠাকরুণও আসিয়া মিলিলেন। তাহার পরে কি ভাবে বৃদ্ধ ও পুত্র কন্যা সুখী হইলেন ও পরস্পরকে গ্রহণ করিলেন তাহা লিখিবার বিষয় নহে। যাঁহাদের হৃদয় আছে তাঁহারা অনুভব করিবেন।

ভিখারিণী।

ছিন্ন-বাস পরা, ধূলায় ধূসরা,
এলো থেলো চুল গুলি,
পাগলিনী প্রায়, চারি দিকে চায়,
চ'লে যায় ঢুলি ঢুলি!

বদন মলিন, অতিশয় ক্ষীণ,
শরীরে নাহিক বল,
যেন দিন হীন, দুঃখেতে মলিন,
আঁখি দুটী ছল্ ছল্!
কে বলনা ভাই, তোমায়ে সুধাই,
আসিল বা কোথা হ'তে?
এ বেশে সাজিয়া, কিসের লাগিয়া,
ফিরিতেছে পথে পথে!
ওই অভাগিণী, বুঝি ভিখারিণী;
নহিলে কে আর হবে?
কাতরে কাঁদিছে, কত কি বলিছে,
শুন শুন ভাই সবে!
"আমি অভাগিনী, দীন কাঙ্গালিণী
কেহ নাই এসংসারে,
শুষ্ক তরু প্রায়, জরাজীর্ণ কায়,
বেড়াই গো দ্বারে দ্বারে!
ছিল গো আমার, সোণার সংসার,
সুখের পসরা-ডালা,
পতি পুত্র ধন, আত্মীয়-স্বজন,
সোহাগের মণি-মালা!
মনে হ'লে হায়, বুক ফেটে যায়,
সে সকলে সমাদরে,
আমি গো রাক্ষসী, হাসি হাসি বসি,
দিয়াছি যমের করে!
এবে অনাথিনী, আমি অভাগিনী,
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে,
মাথা দিতে ঠাঁই, কোথাও না পাই,
বিধাতার এ সংসারে!
টেনা ছেঁড়া বাস, অঙ্গে বার মাস,
বাস মোর তরু-তলে,
উদরের তরে, ফিরি ঘরে ঘরে,
'ভিক্ষা দাও মা গো ব'লে!'

নাহি জানি হায়, বিধাতার পায়,
করিয়াছি পাপ কত;
সেই সে কারণে, এ পোড়া জীবনে,
দহিতেছে অবিরত!
মৃত্যু ভিক্ষা চাই, বিধাতার ঠাঁই,
সকাতরে বারে বার!
না শুনেন হরি; আমি যদি মরি,
কে বহিবে দুঃখ-ভার?
এ পড়া কপাল, থাকে যত কাল,
জ্ব'লে পুড়ে হব ছাই!
নয়নের জল, রহিবে সম্বল,
মুছাবার কেহ নাই!"
মরি মরি হায়, বুক ফেটে যায়,
শুনে ও দুঃখের গান,
কি জানি কেনরে, বুকের ভিতরে
কেমন করে যে প্রাণ!
চল চল হায়, ডাকিয়া উহায়,
ঘরেতে লইয়া যাই,
কন্যা পুত্র ভাই, কেহ ওর নাই,
সব হব আমরাই!
মুছাব নয়ন, ঘুচাব বেদন,
রাখিব যতন ক'রে
ও মলিন মুখে, হাসিটি দেখিলে,
নাচিব আমোদ ভরে!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

তোমরা সকলেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন না কোন কবিতা পাঠ করিয়াছ। কবিগাথা, কবিতামালা, পদ্য প্রকাশ প্রভৃতি বালক বালিকাদিগের পাঠ্য প্রায় সকল পদ্য গ্রন্থে তাঁহার কাব্যের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত আছে। ইনি বাঙ্গলার এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। ইনিই প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় অমৃতাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করেন। মেঘনাদ বধ কাব্য ইঁহার রচিত সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ। আমাদের একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে "বহু দোষ সত্বেও এই কাব্য খানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলতঃ 'গাঁথিব নূতন মালা—

রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে

আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ সফলতা হইয়াছে, এবং এই 'নূতন মালা' চিরকাল তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।"

যশোহর জেলায় সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমধুসূদন দত্তের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত; ইনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। মধুসূদন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। ইঁহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মধুসূদন বাল্যকালে নিজ গ্রামের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন। পরে একটু বড় হইলে কলিকাতায় হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজি ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মাইকেল নাম গ্রহণ করেন। পিতা হিন্দু ছিলেন, পুত্র খৃষ্টান হইল, এই ব্যাপারে তিনি যদিও যারপর নাই মর্ম্মাহত হন, তথাপি একমাত্র সন্তান বলিয়া স্নেহবশতঃ পুত্রকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। খৃষ্টান হওয়ার পর চারি বৎসর কাল শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এইখানে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপরে মান্দ্রাজ গমন করেন। মান্দ্রাজে সর্ব্বদা ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং এক জন উত্তম ইংরাজী লেখক বলিয়া গণ্য হয়েন। এই সময়ে মান্দ্রাজ কলেজের ইংরাজ প্রধান শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মান্দ্রাজের এথীনিয়ম নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন এবং সম্পাদক স্বদেশ গমন করিলে পর ইনিই ঐ পত্রের সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন ও খুব দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি একখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইংরাজী ভাষায় পদ্য লিখিয়াছেন তাহা যে নিতান্ত অসার তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার কবিত্ব শক্তির ও ইংরাজী ভাষার উপর যে বিলক্ষণ দখল জন্মিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত তিনি এক কলম বাঙ্গালা লিখেন নাই বরং বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষাকে বড় ঘৃণা করিতেন।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল শিক্ষকতা করিয়া ১৮৫৬ সালে স্ত্রীর সহিত স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন।

স্বদেশে প্র

কাতার পুলি

অধীনে প্র

নিযুক্ত হয়ে ১৮৫৮ সালে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এবং এই রত্নাবলীর অনুবাদের পর হইতেই তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি একটু অনুরাগ জন্মে এবং সেই সময়ে তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন।

তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া যে কয় বৎসর এখানে ছিলেন তাহাতে বিশেষ শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মন বিষাদে পূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহার এই সময়ে প্রণীত আত্ম-বিলাপ পাঠেই জানা যায়।

পরম দয়াশীল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মধুসূদন দত্তকে বিলাতে আইন শিখিবার জন্য অনুগ্রহ করিয়া অনেক অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহারই অর্থে ১৮৬২ সালের শেষভাগে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমন করেন। বিলাতে গিয়াও মাতৃভাষা উপেক্ষা করেন নাই। ইউরোপে ইনি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী প্রণয়ন করেন। ইনিই বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা প্রথম প্রচলিত করেন।

যথাসময়ে বারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং হাইকোর্টে বারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বারিষ্টারিতে তত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। ইহাঁর সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর চারি দিবস পরে ইহাঁরও মৃত্যু হয়। অনেক দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জুন রবিবার বেলা দুইটার সময়ে আলিপুর দাতব্য ...ভাবে দুঃখ কষ্টে সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। দরিদ্রের মৃতদেহ বলিয়া সরকারি ব্যয়ে সরকারি গোরস্থানে দেহের সমাধি হইল। তিনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সাধের ধন বঙ্গভাষার অমূল্য রত্ন তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি নিলাম হইয়া গেল; বটতলার কোন দোকানদার অতি সামান্য মূল্যে সেগুলি ক্রয় করিয়া লইল। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ পথের ভিখারী হইল। সামান্য উদরান্নের জন্য পরের গলগ্রহ হইল।

একে একে তাঁহার সকল সন্তানেরা ইহ সংসারের দুঃখ এড়াইয়াছে এখন কেবলমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান এলবার্ট দত্ত বিদ্যমান। ইনি সেণ্টজেভিয়ার কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর সমুদয় ব্যয় ভার ইহাঁর পিতার বন্ধুগণ বহন করিতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সরকারি গোরস্থানে ইহাঁর গোর হইয়াছে। সরকারি গোরস্থানের নিয়ম এই যে, দশ বৎসরের মধ্যে কাহারও গোরের উপর কোন রূপ স্মৃতিস্তম্ভাদি নির্ম্মিত না হইলে, গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে সেই গোরের দেহপঞ্জর উত্তোলিত করিয়া তৎস্থানে অপরের গোর দেওয়া হইয়া থাকে।

এই গোরস্থানের কোন কর্ম্মচারী কোন সময়ে বামাবোধিনীর সম্পাদক ও সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য ভদ্রলোকের নিকট বলেন যে, প্রায় পনর বৎসর হইল মাইকেল মধুসূদন দত্তের এখানে গোর হইয়াছে, নিয়মানুসারে তৎস্থানে অপর গোর দেওয়ার সময় অনেক দিন হইল হইয়া গিয়াছে; যদি সত্বর কোন রূপ

করা হইবে। এ কথা শুনিয়া ..

চন্দ্র দত্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভাতে এ বিষয় উত্থাপন করেন এবং তাঁহারা কবিবরের জন্ম ভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যশোহর খুলনা সম্মিলনীর সহিত একযোগে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইয়া, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া অনেক মাননীয় ব্যক্তির নামে জনসাধারণের নিকট এজন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক আবেদনপত্র প্রচার করেন। তদনুসারে বঙ্গের ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত, ও দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ১০৩৮/০ আনা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই টাকা হইতে প্রায় ৮০০ শত টাকা খরচে এক সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পোনের বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন, "আজ বঙ্গভাষার উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমগুলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।" বাঙ্গালী কবির জন্য বাঙ্গালী তখন রোদন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য বাঙ্গালী এত দিন কিছুই করে নাই। যে জাতি স্বদেশের মহৎ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের উপযুক্ত সম্মান না করে, তাঁহাদিগের গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চেষ্টা না করে, সে জাতি কখনও উন্নত হয় না; মহত্ব যাহাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই, তাহারা কখনও মহৎ হইতে পারে না।

ছিলেন, তাঁহার
ন কোন চিহ্ন
ংলণ্ড প্রভৃতি
কোন [illegible] তাঁহার কত গৌরব, কত সম্মান দেখিতাম। কিন্তু বাঙ্গালী আজ পোনের বৎসরের মধ্যে জাতীয় গৌরব মধুসূদনের নাম চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা দূরে থাক্, তাঁহার সমাধির উপর একখণ্ড সামান্য প্রস্তর স্থাপন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এতদিন পরে সে কলঙ্ক কতক পরিমাণে দূর হইয়াছে। কবিকুল ভূষণ মধুসূদনের সমাধির উপর একটী প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপিত হইল। সমাধি স্তম্ভটী ক্ষুদ্র হইলেও, দেখিতে সুন্দর হইয়াছে।

১লা ডিসেম্বর শনিবার সমারোহ করিয়া তাঁহার সমাধিস্তম্ভের আবরণ উন্মুক্ত করা হয়। সমাধিস্থলে গণ্য মান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন কমিটির সম্পাদক রূপে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ পাঠ করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কে সমাধিস্তম্ভ উন্মুক্ত করিতে বলেন।

আবরণ উন্মোচনের পূর্ব্বে তিনি ইংরাজিতে কিছু বলেন। তিনি বলিলেন "অদ্যকার অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে যে কার্য্যে ভার দিয়াছেন তাহা আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু আমি মনে করি, সাহিত্যজগতে খ্যাতাপন্ন কাহারও উপর যদি একার্য্যভার অর্পিত হইত, এবং আমরা যে বিজ্ঞ যশস্বী কবিবরের স্মৃতির সম্মানার্থ এখানে সমবেত হইয়াছি তিনি যদি তাঁহার এই সমাধিস্থানের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতেন, তবে ইহা অধিকতর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। তবে পরলোকগত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের শেষ ভাগে আমি তাঁহার অন্তরতম